পার্বত্য তথ্য কোষ

৭

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ' ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ - ৭

অনুসন্ধান

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই ঃ পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক ঃ আতিকুর রহমান

প্রকাশক ঃ পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ ঃ বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং ঃ আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর ঃ বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
ঃ মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক ঃ ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য ঃ খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

যোগাযোগে ঃ আতিকুর রহমান মোবাইল ঃ ০১১১৯৬১২৭২৪৮

পার্বত্য তথ্য কোষ

খণ্ড-৭ ঃ অনুসন্ধান

সূচীপত্র ঃ

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে অনেক রাখ ঢাক ও অজ্ঞতা বিদ্যমান। শান্তি স্থাপনের পথে এটা প্রথম বাধা। তৎপর বাধা হলো ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একশন রিএকশন চুক্তি ও ব্যবস্থাবলী।

প্রথমেই জানতে হবে পার্বত্য উপজাতীয় লোকদের রাজনৈতিক মর্যাদা কী? তারা কী আদি স্থানীয় বাসিন্দা? পার্বত্য চট্টগ্রাম কী বাংলাদেশের সাথে সংযোজিত অঞ্চল? পার্বত্য অঞ্চলের গোটাটাই কী জনবসতি? নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থা গ্রহণে এগুলো বিবেচ্য।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ সাল পর্যন্ত এতদাঞ্চল ছিলো চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনভুক্ত অখন্ড চট্টগ্রাম। প্রকৃতিগত কারণে এতদাঞ্চল ছিলো পর্বত সঙ্কুল বনভূমি। লোকালয় বা মানব বসতিহীন এই দুর্গম অঞ্চলে লুসাই, ত্রিপুরা চীন পর্বতবাসী কিছু পাহাড়ী লোক সাময়িক জুম চাষে লিপ্ত হতো এবং মওসুম শেষে পুনরায় নিজেদের সীমান্ত পারের আদি বাসস্থানে ফিরে যেতো। ঐ ভ্রাম্যমান জুমিয়াদের একটি শক্তিশালী দল কুকি নামে খ্যাত ছিলো। নৃশংসতার গুণে তারা ছিলো মানবমুন্ড শিকারী নামে কুখ্যাত। সেই প্রাচীন সুলতানী আর মোগল আমলেও এতদাঞ্চল শাসন বহির্ভূত বা উপজাতীয় অঞ্চল ছিলো না। বন ও পাহাড়ের আনাচে কানাচে জুম চাষরত বহিরাগত মওসুমী জুমিয়াদের পাকড়াও করে জুমকর প্রদানে বাধ্য করা হতো। সে কর নগদে বা শস্যে আদায় করা কালে তন্তু পণ্য কার্পাস তূলাকেই প্রাধান্য দেয়া হতো। এই জুম চাষ ও কর সূত্রেই এতদাঞ্চলের বিকল্প রাজস্ব নামকরণ হয় জুম বঙ্গ এবং আঞ্চলিক প্রাকৃতিক নাম হয় কুহিস্তানে চাটগাম। জুমবঙ্গ নামটি আজকাল অবলুপ্ত হলেও দ্বিতীয় প্রাকৃতিক নামটি তখনকার সরকারী ফার্সি ভাষা থেকে ভাষান্তরিত হয়ে এখন তা বাংলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ইংলিশে চিটাগাং হিল ট্রাক্টস।

বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ আমলেই প্রথম আংশিকভাবে আরাকানী শরণার্থী অধ্যুষিত জনবসতিতে পরিণত হয়, এবং এই প্রবাসী অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলীয় বন ও পাহাড়কে ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করে পৃথক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পরিণত করা হয়, যেখানে বাঙালীরা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু। অথচ তখনো শরণার্থী অবাঙালীরা আইনতঃ বিদেশী, এবং এদেশে তাদের কোন বৈধ নাগরিকত্ব ছিলো না। রেগুলেশন নং ১/১৯০০ জারির পর ~~শত তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়কালে~~ ঐ প্রবাসীদের বিদেশী শরণার্থীর পরিচয় ঘোচাতে সরকার জারি করেন ইমিগ্রেশন ইন্টু দি হিল ট্রাক্টস নামীয় একটি আইন, যা ধারা নং ৫২ আকারে হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলে যুক্ত হয়েছে। এই প্রথম আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা থেকে আগত বিদেশী বিজাতীয়রা এদেশে বসবাসের আইনী বৈধতা পান। এই ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন আইনের বলে বিদেশাগত উপজাতীয়রা এ দেশের বৈধ নাগরিক রূপে বিবেচিত। অথচ ঐ ঔপনিবেসিক আইনের বৈধতা এখনো চ্যালেঞ্জযোগ্য।

বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে স্বদেশী।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ঃ ভূষণছড়া গণতহ্যা -১

রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈরীতার কারণে পৃথিবীতে অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে এবং ইতিহাসে তার স্থান ও হয়েছে। অসভ্য বর্বর যুগের মত ঘটনাগুলো আধুনিককালেও বিচার্য হচ্ছে না। প্রাচীন ভারতীয় সম্রাট অশোক, যুদ্ধের নৃশংসতায় গভীর মর্মাহত হয়ে, অহিংস বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন যুদ্ধ পরিহার সহ রাজ্য শাসন করেছিলেন। এটা একটা অনন্য মানবতাবাদী নজির। তৎপর মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার শুরুতে যুদ্ধাভিযানকালে খলিফার পক্ষ থেকে সেনাপতিদের উপদেশ দেয়া হতোঃ নিরস্ত্র সাধারণ লোককে যেন হত্যা করা না হয়। শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও স্ত্রীলোকেরা যেন আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ফল ফসল ও ধর্মস্থান যেন ধ্বংস না হয়। অযথা গণহত্যা করা যাবে না।

বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চ মূলনীতির প্রথমটি হলোঃ প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি গ্রহণ করা। ইসলাম ধর্মেরও মূলনীতি হলোঃ অযথা প্রাণী হত্যা হারাম বা নিষিদ্ধ। বিকশিত সভ্যযুগের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমে, নিরপরাধ নিরস্ত্র লোকজনকে নির্বিচারেও দলবদ্ধভাবে হত্যা করাকে দন্ডনীয় যুদ্ধাপরাধ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। সে থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনেল গঠন করে, যুদ্ধাপরাধের বিচার হচ্ছে। অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্র প্রধান সেনা প্রধান ও সরকার প্রধানদেরও রেহাই দেয়া হচ্ছে না। বসনিয়ায় অনুষ্ঠিত গণত্যার জন্য, সাবেক যুগস্লাভ রাষ্ট্র প্রধান মিঃ স্লাবদান মিলোসেভিচ বর্তমানে বন্দি ও বিচারাধীন আছেন। কম্বডিয়ার সাবেক সরকার প্রধান পলপটের গণহত্যার বিচারটি ও প্রক্রিয়াধীন আছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন অনুষ্ঠিত গণহত্যারও বিচার হোক, এটা একটি চলমান দাবী, এবং সাথে সাথে এ দাবীটিও উত্থিত হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দু দশকের অধিক কাল ধরে, বিদ্রোহী পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী, যে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছে, তারও বিচার অনুষ্ঠিত হোক। এই গণহত্যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো ১৯৮৪ সালের ৩১ মে তারিখে অনুষ্ঠিত ভূষণছড়া গণহত্যা, ও ১৯৯৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে সংঘটিত পাক্যুয়াখালি গণহত্যা। ভূষণছড়ায় একই অর্ধ রাত্রি সময় কালে হত্যা করা হয়েছে তিন শতাধিক নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুকে। তাদের গণ কবরগুলো এখনো ঘোষণা করছে ঃ ঘটনাটি অবশ্যই মর্মান্তিক ও বিচার্য যুদ্ধাপরাধ।

পাক্যুয়া খালিতে আলোচনা বৈঠকের জন্য আহুত ৩৫ জন যুবকের উপর অতর্কিতে শান্তিবাহিনী সদস্যরা আক্রমণ করে। একজন মাত্র আত্মরক্ষা ও পালাতে সক্ষম হয়।

তারই খবর ও পথ প্রদর্শনে পরের দিন ২৮টি লাশ উদ্ধার করে আনা হয় । অবশিষ্ট ৬ জন অদ্যাবধি নিখোঁজ আছে । লংগদু সদরে ঐ লাশগুলো সারি বেঁধে একই গণ কবরে শায়িত । পানছড়ির ৯ জন শহীদের লাশ রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত সফর করেছে । বাকি প্রায় ত্রিশ হাজার নিহতের লাশ, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । অধিকাংশের দাফন কাফন পর্যন্ত কপালে জুটেনি । বেওয়ারিশ ও নিখোঁজ লাশ হিসেবে শিয়াল কুকুরের খোরাক হয়ে, কেবল কংকাল রূপে পাহাড় ও বনে পড়ে আছে । এই নৃশংসতা বিনা বিচারে পার পেয়ে গেলে, এটি অপরাধ ও দন্ডনীয় কুকর্ম বলে, নজির স্থাপিত হবে না । এটা হবে আরেক নিন্দনীয় ইতিহাস । দেশে সামরিক শাসন ও সংবাদ প্রচারের উপর সেনসার ব্যবস্থা আরোপিত থাকায় এবং পাহাড় অভ্যন্তরে যাতায়াত ও অবস্থান সহজ আর নিরাপদ না হওয়ায়, অধিকাংশ গণহত্যা ও নিপীড়ন, খবর হয়ে পত্র পত্রিকায় স্থান পায়নি । তবু অসমর্থিত ছিটেফোটা তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠনগুলো, যে হিসাব প্রকাশ করেছে, তাতে জানা যায়, উপজাতীয় বিদ্রোহীদের হাতে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ । এটা আঁতকে উঠার মত বড় ঘটনা । দুঃখজনক ব্যাপার হলোঃ এতদাঞ্চলে কর্মরত আর্মি, বি,ডি,আর, পুলিশ ও সিভিল প্রশাসন, প্রতিটি নৃশংস ঘটনাকে তদন্ত ও তদারক করেছেন । তবে তথ্য প্রচার ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের মুখে কুলুপ আঁটা । প্রতিপক্ষ উপজাতীয়রা তিলকে তাল করে নিজেদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছে । তাদের বিপক্ষে নৃশংসতার প্রচার হয়নি । এতে দুনিয়াব্যাপী এক তরফা ধারণা জন্মেছে যে, পার্বত্য উপজাতিরা সত্যই নির্যাতনের শিকার ।

কর্তৃপক্ষীয় ধামাচাপা ও দমনকে অবজ্ঞা করে, নির্যাতিত বাঙালীরা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং পাল্টা কিছু ঘটায় । অনুরূপ ঘটনাবলী থেকে তাদেরকে বিরত রাখার পক্ষে দমন পীড়ন যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রতি খয়রাতি অনুগ্রহ বিতরণও করা হয়েছে । পাক্যুয়াখালির নিহতদের উদ্ধারকৃত ২৮টি লাশ এক শোকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ পরায়নতার উদ্ভব ঘটায় । কঠোরতার মাধ্যমে তা দমনের ব্যবস্থা গৃহীত হলে, বাঙালীরা আরো ক্ষেপে যাবে, এই বিবেচনায়, উপস্থিত কয়েকজন মন্ত্রী, ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাঙালীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও নিহতদের পরিবার প্রতি পঞ্চাশ হাজার করে টাকার ক্ষতিপূরণ দান ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত নিহতদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হয় । পরে বিএনপির পক্ষ থেকেও টাকা পাঁচ হাজার করে অনুদানের ঘোষণা আসে । আওয়ামী সরকার ও বিএনপি দলের মঞ্জুরকৃত এই সান্ত্বনামূলক ব্যবস্থা, আপাততঃ বাঙালীদের ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করে । তবে অনুরূপ কোন সান্ত্বনামূলক ব্যবস্থা অন্যান্য নিহতদের বেলায় গৃহীত হয়নি । অথচ ভূষনছড়া গণহত্যা পরিদর্শনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্বয়ং সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন । ওসি, ডিসি, এস,পি, বিগ্রেডিয়ার, কমিশনার, ডি আই জি, জিওসি ইত্যাদি কর্মকর্তারাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন । কিন্তু সবাই তৎপর ছিলেন ঘটনাটি চাপা দিতে ও লাশ লুকাতে । কয়েকদিন যাবৎ একটানা গণকবর রচনার প্রক্রিয়া চলেছে । তজ্জন্য জীবিত সেটেলারদের আহার

নিদ্রা ও বিশ্রামের ফুরসত ছিলো না। গর্তে গর্তে গণকবর রচনা করে, একেক সাথে ৩০/৪০টি লাশকে চাপা দেয়া হয়েছে। এভাবে লোকালয়গুলো পঁচা লাশ ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত হলেও, পাহাড় ও বনে অবস্থিত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো দাফন কাফনহীন অবস্থায় পচতে থাকে, ও শিয়াল কুকুরের খাদ্য হয়। দুর্গত পরিবারগুলো পোড়া ভিটায় খাদ্য ও আচ্ছাদনহীন দিনযাপনে বাধ্য হয়। তাদের সবাইকে পরিবার প্রতি বরাদ্দকৃত তিন একর পাহাড়ী জমি থেকে, নিরাপত্তার অজুহাতে তুলে এনে, নদী তীরবর্তী নিরাপত্তা ক্যাম্প এলাকায়, বিশ শতক পরিমাণ আবাসিক ভিটাতে জড়ো করা হয়। এদের অনুদান ও ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসন প্রয়োজনীয় ছিলো। কিন্তু অদ্যাবধি এরা অবহেলিত। এই হত্যা ও অবহেলা অমানবিক আচরণ। আজ দীর্ঘ দিনের মাথায়ও দেখা যায়ঃ তাদের অধিকাংশ নিত্য আনে নিত্য খায়, এরূপ কায়িক মজুর। ঘরের আশেপাশে ফল ফসল ও তরিতরকারী উৎপাদন, বাঁশ, গাছ কাঁটা, মাছ ধরা, মজুর খাঁটা, ও ছোট খাটো বেপারই তাদের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন। অথচ দেশ ও জাতির জন্য এদের ত্যাগ বিরাট। এই নেংটি বালীরা আছে বলেই এই পর্বতাঞ্চল বাংলাদেশ হয়ে আছে। কেবল সৈন্য বলে এতদঞ্চালের বাংলাদেশ হয়ে থাকা অসম্ভব। এতদাঞ্চলের প্রতিরক্ষার অংশ বাঙালী বসতি স্থাপন। যে সরকার এখানে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছিল সে সরকারই পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়েছে। সেটেলার বাঙালীরা এই সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থক। তাকে ক্ষমতাসীন করার জন্য তারা ভোট দিয়েছে। তার সাফল্যে ও তাদের দাবীঃ সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার ও পৃষ্ঠপোষণ।

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রসঙ্গক্রমে ভূষণছড়া গণহত্যার বিষয়টি আলেচিত হয়। তখন কিছু ভুক্তভোগী ভোটার নিজেদের ক্ষোভ দুঃখ নিয়ে সোচ্চার হোন। এই ক্ষোভ দুঃখ স্থানীয় সহ জাতীয় পত্র পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। আলোচনার বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাতে সাংবাদিক ও মানবতাবাদী মহলে সঙ্গতভাবেই দুঃখবোধ সমবেদনা ও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারা তথ্য প্রচারের অতীত অপারগতার ক্ষতি পূরণে এগিয়ে আসেন। বিষয়টি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালিত হয়। বেরিয়ে আসে তিন শতাধিক নিহতের নাম, ধাম, পরিচয়, ঘটনার নৃশংসতা, ও বহু গণকবর। এসবই ৩১ মে ১৯৮৪ সালের এক অর্ধরাত্রের নৃশংসতার শিকার, যার হোতা হলো বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী। ঘটনাস্থল বড়কল থানাধীন ভূষণছড়া নামক ইউনিয়ন ও তার পার্শ্ববর্তী বাঙালী সেটেলার অধ্যুষিত এলাকা। তাদের অপরাধ হলোঃ তারা বহিরাগত সেটেলার বাঙালী। সরকারী প্ররোচনায় তারা এতদাঞ্চলে এসে পার্বত্য জায়গা জমিতে ভাগ বসিয়েছে, যে জায়গা জমির অধিকাংশ খাস হলেও, আগে ছিলো একচেটিয়া উপজাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সেটেলারদের দ্বিতীয় অপরাধ হলো তারা বাংলাদেশ আর্মির ঢাল, যারা বিদ্রোহী শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র প্রতিপক্ষ। বাঙালী হত্যা ও তাড়ানো মানে আর্মিকে দুর্বল করা এবং বেকায়দায় ফেলা যার মানে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও অখন্ডতাকে হীনবল করে দেয়া। তখন জুম্ম্যাল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন, এমন কি স্বাধীনতা লাভও হবে সহজ। এই হলো উপজাতীয় নৃশংসতার মুল লক্ষ্য ও কারণ।

প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগী, এতিম, ও বিধবাদের মৌখিক বর্ণনায় পাওয়া গেলো নিহতদের এক বিরাট তালিকা। তবে আগে পরে নিহত সব শহীদদের তালিকা আরো বিরাট। তা পেতে আরো অনুসন্ধানের দরকার। এখানে শুধু ৩১ মে ১৯৮৪ তারিখের ভূষণছড়াবাসী সেটেলার বাঙালী শহীদদের সংখ্যা হলো তিনশতের অধিক। তালিকা প্রস্তুত করার পর যাত্রা শুরু হলো গণকবর পরিদর্শনে। পাড়া, বন, পাহাড়, ও দূর দূরান্তে তা ছড়ানো ছিটানো। দুদিন পায়ে হেটে অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তার কিছু কিছু দেখা হলো। লোকালয়ে অবস্থিত প্রধান দুটি গণকবরের অবস্থান হলো ভূষণছড়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাঙ্গন ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন। এখানে প্রথমটিতে এক সাথে ৩৮ জন শহীদ শায়িত আছেন এবং দ্বিতীয়টিতে আছেন ২৩ জন। বর্ণনা মতে বনে পাহাড়ে বহু কংকাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা খুঁজে দেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ভুক্তভোগীদের আহাজারিতে প্রকাশ পেলোঃ এ পর্যন্ত সান্ত্বনা মূলক কোন সরকারী অনুদান বা ক্ষতিপূরণ তাদের ভাগ্যে জুটেনি। অথচ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত উপজাতীয় পাবলিকরা, প্রতিশোধ ও শাস্তির ভয়ে সীমান্ত পারে গিয়ে আত্মগোপন করায়, তাদের ফিরিয়ে এনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। বাঙালীদের ধনমান ও প্রাণ গেলেও তাদের প্রতি সরকার সহ উপজাতি নিয়ন্ত্রিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বিরূপ ও বিরাগভাজন।

কোন বড় যুদ্ধে কয়েক ঘন্টার ভিতর কোন একক পরিবেশে অত্যন্ত নৃশংসভাবে এত বিপুল সংখ্যক বেসামরিক সাধারণ লোককে কুপিয়ে পিটিয়ে গুলিতে ও আগুনে পুড়িয়ে মারার নজির ইতিহাসে বিরল। এ কাজটি শাস্তিযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অপরাধ হলেও, এখানে তার কোন তত্ত্ব তালাস ও বিচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হচ্ছে না, এটা আশ্চর্যজনক। ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে তারা এবং ভুক্তভোগী মহলও চিহ্নিত। এ নিয়ে সে সময় বড়কল থানায় ডায়রীও করা হয়েছে। দেশের প্রেসিডেন্টসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই, ঘটনাগুলোর ভয়াবহতার প্রত্যক্ষদর্শী। এ ঘটনাগুলোর বিচার নিষিদ্ধ করে কোন ইনডেমনিটি আইনও জারি করা হয়নি। তবে দীর্ঘদিন পরে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির দ্বারা সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে, যা চিহ্নিত অপরাধীদের পক্ষে ছাড়পত্র বিশেষ। ভুক্তভোগী ও ফরিয়াদী নেংটি বাঙালীরা এই চুক্তি ও ক্ষমার তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও, গুণী ও জ্ঞানীজন বুঝেনঃ চুক্তি ও ক্ষমার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার জড়িত নয়। এটা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লা ও পার্বত্য জনসংহিতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার মধ্যকার সমঝোতা। এটাকে সরকারী চুক্তি ও ক্ষমা বলা নেহাত প্রতারণা।

হাসনাত আব্দুল্লা ছিলেন সরকার নিযুক্ত সংলাপ কমিটির আহবায়ক। তাকে চুক্তি সম্পাদনের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকার সমূদয় দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত। ঘটনাটির নৃশংসতার অনুসন্ধান, তার দায় দায়িত্ব নিরূপন, তার বিচার অনুষ্ঠানে ট্রাইবুনেল গঠন ইত্যাদি, এবং দোষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাকড়াও করতঃ ট্রাইবুনেলের নিকট সোপর্দ করতে, সরকারের পক্ষে কোন বাধা নেই। তবে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে

বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া স্থানীয় উপজাতি সমাজে ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘটা সম্ভব, এটাই সরকারের বিবেচ্য। এই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সরকারের উপর অতিমাত্রিক ভাবে ক্রিয়াশীল। অথচ এটি আসলে আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত অপরাধ। দুনিয়াবাসী পক্ষপাত মূলক ভাবে জানেঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা নিরীহ আর নির্যাতিত। বিপরীতে তারাও যে গুরুতর অনেক নৃশংসতা ও অপরাধের হোতা, এ কথা বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবগত হলে, তারা ধিক্কার জানাতো অবশ্যই। বাংলাদেশ আর বাঙালীদের অনেকে বিপক্ষদের বিরুদ্ধে অনেক বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী। তাদের অনেকে উচ্চ পদে ক্ষমতাসীন থাকাকালে, নিজেদের কু কর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হওয়ার আশংকায়, অনুরূপ বিচার অনুষ্ঠানের বিরোধী। তারা পক্ষে বিপক্ষে বিচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটাচ্ছেন।

আমাদের অভিমতঃ বিচার এক তরফা কাম্য নয়। দেশ ও বাঙালী পক্ষের অপরাধীদেরও রেহাই দেয়া উচিত হবে না। নির্যাতিত উপজাতিদের পক্ষেও রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে, দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য সোপর্দ করা আবশ্যক। সাধারণভাবে অভিযুক্ত পক্ষ হলোঃ জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী। এই সংগঠন দুটির কারা গণহত্যার মত গুরুতর নৃশংসতার জন্য দায়ী, জীবিত ফরিয়াদীদের সাক্ষ্যে ও দলিল পত্রের মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। সুশাসন, ন্যায় বিচার, ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, অপ্রিয় হলেও সরকারকে গণহত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশেষে আমাদের শেষ আবেদনঃ এখানকার বিপুল এতিম, বিধবা ও দুস্থদের প্রতি সরকার সদয় হোন।
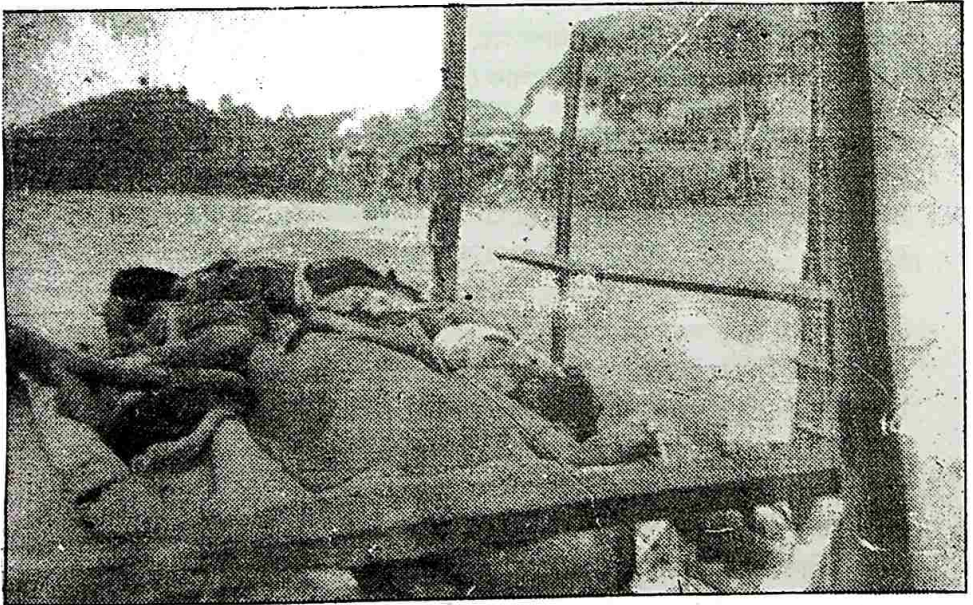
বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর হাতে নিহতদের লাশের স্তুপ

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ঃ ভূষণছাড়া গণহত্যা-২

স্থানীয় ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শী মুরব্বীদের বর্ণনায় মর্মন্তুদ বর্ণনা পাওয়া গেলো। তারা জানালেন ৩০ মে তারিখ দিনের বেলায় খবর রটে যায় সামনের রাত্রেই শান্তিবাহিনী জ্বালাও পোড়াও মার দাঙ্গা শুরু করতে যাচ্ছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু করার কিছু ছিলো না। বাঙ্গালীরা নিরস্ত্র। নিরাপদ আত্মগোপনের বা পালাবার জায়গাও নেই। বাড়ি ঘর ছেড়ে পাহাড় বনে লুকাতে গেলে, সেখানেও শান্তিবাহিনী ও বিদ্বিষ্ট পাহাড়ীরা ওৎ পেতে বসা। সরকারের পক্ষে শান্তিরক্ষী হিসেবে আছে কিছু ভি,ডি,পি সদস্য, আর্মি আর বিডিআর সৈনিক। তাও যথেষ্ট নয়। তাদের ক্যাম্প অনেক দূরে দূরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেটেলার বসতিগুলো পাহারা দেয়া ও নিরাপদ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং নিরুপায় আল্লাহ ভরসা, যা হবার হবে। এরূপ অনিশ্চয়তা ও ভয়ের ভিতরই নিজ নিজ বাড়ি ঘরে থাকতে হলো। সবার জানা মতে নদী তীরবর্তী সেটেলার বসতিগুলোর পিছনে সংলগ্ন পাহাড় ও বনে শান্তি বাহিনী ও তাদের দোসররা অবস্থিত। শালিশ বিচার ও চাঁদা দান উপলক্ষ্যে কোন কোন বাঙালীর সেখানে যাতায়াত ও কমান্ডার মেজর রাজেশের সাথে সাক্ষাত সম্পর্ক ছিলো। বিপদের আশংকায়, স্থানীয় সেটেলার বাঙালীদের পক্ষে, ঐ কমান্ডারের দয়া ভিক্ষা করে দু একজন লোক চেষ্টাও করেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হয়।

এই ভয়াল রাতের প্রথম শহীদ হলো শেফালী বেগম নামের ২০ বছরের এক যুবতী, সে থমথমে অবস্থা অবলোকন ও প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য রাত আনুমানিক আটটায় ঘরের বাহির হয়েছিলো। সে জানতো না ইতিমধ্যে শান্তিবাহিনীর যাতায়াত ও সমাবেশ হওয়া শুরু হয়ে গেছে। সামনে পড়ে যাওয়ায় শেফালীকেই গুলিতে প্রথম প্রাণ দিতে হলো। কলা বন্যা, গোরস্থান, ভূষণছড়া, হরিনা হয়ে ঠেকামুখ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট এলাকা জুড়ে সন্ধ্যা থেকে আপতিত ভয়াল নিস্তব্ধতা। কুকুর শিয়ালের ও সাড়া নেই। আর্মি, বিডিআর, ভিডিপি সদস্যরাও ক্যাম্প-বন্দি। অতর্কিতে বাহির দিক থেকে রাত আটটায় ধ্বনিত হয়ে উঠলো, শেফালী হত্যার সাথে জড়িত ঐ গুলির শব্দটি। তৎপরই ঘটনাবলীর শুরু। চতুর্দিকে ঘর বাড়িতে আগুন লেলিহান হয়ে উঠতে লাগলো। উত্থিত হতে লাগলো আহত নিহত লোকের অনেক ভয়াল চিৎকার, এবং তৎসঙ্গে গুলির আওয়াজ, জ্বলন্ত গৃহের বাঁশ ফোটার শব্দ, আর আক্রমণকারীদের উল্লাস মুখর হ্রেসা ধ্বনি। এভাবে হত্যা, অগ্নিসংযোগ আর্তচীৎকার ও উল্লাসের ভিতর এক দীর্ঘ গজবী রাতের আগমন ও যাপনের শুরু। চিৎকার, আহাজারি ও মাতমের ভিতর রাতের পর সূর্যোদয়ে জেগে উঠলো

পর্য্যুদস্ত জনপদ। হতভাগ্য জীবিতরা আর্তনাদে ভরে তুললো গোটা পরিবেশ। অসংখ্য আহত ঘরে ও বাহিরে। লাশে লাশে ভরে আছে পোড়া ভিটা পথঘাট ও পাড়া। সবাই ভীত বিহ্বল। এতো লাশ এতো রক্ত আর এতো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, এক অর্ধরাতের ভিতর এলাকাটি বিরান। অদৃষ্ট পূর্ব নৃশংসতা। অভাবিত নিষ্ঠুরতা। ওয়ারলেসের মাধ্যমে এই ধ্বংসাত্মক দুর্ঘটনার কথা, স্থানীয় বিডিআর ও আর্মি কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বমহলে অবহিত করেন। শুরু হয় কর্তৃপক্ষীয় দৌড়, ঝাপ, আগমন ও পরিদর্শন। চললো লাশ কবরস্থ করার পালা ও ঘটনা লোকানোর প্রক্রিয়া। ঘটনাটি যে কত ভয়াবহ, মর্মন্তুদ আর অমানবিক এবং শান্তি বাহিনী যে কত হিংস্র পাশবিক চরিত্র সম্পন্ন ও মানবতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক সংগঠন, তা প্রচারের সুযোগটাও পরিহার করা হলো। খবর প্রচারের উপর জারি করা হলো নিষেধাজ্ঞা। ভাবা হলোঃ জাতীয় ভাবে ঘটনাটি বিক্ষোভ ও উৎপাতের সূচনা ঘটাবে। দেশ জুড়ে, উপজাতীয়রা হবে বিপন্ন।

ঘটনার ভয়াবহতা আর সরকারী নিষ্ক্রিয়তায়, ভীত সন্ত্রস্থ অনেক সেটেলারই স্থান ত্যাগ করে পালালো। পলাতকদের ঠেকাতে পথে ঘাটে, লঞ্চে গাড়িতে নৌকা সাম্পানে চললো তল্লাসী ও আটকের প্রক্রিয়া। তবু নিহত আর পলাতকরা মিলে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হলো এই জনপদ থেকে লাপাত্তা। শুরু হলো জীবিতদের মাধ্যমে লাশ টানা ও কবরস্থ করার তুড়জুড়। খাবার নেই, পরার নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, চারদিকে কেবল পঁচা লাশের দুর্গন্ধ। পালাবারও পথ নেই। নিরূপায় জীবিতরা। লাশ গোজানো ছাড়া করার কিছু নেই। দয়াপরবশ কর্তৃপক্ষ কিছু আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। এটাকে দয়া বলা ছাড়া উপায় কী? পেটে দিলে পিঠে সয়, এ যেন তাই। মুরব্বীদের মাঝে খুঁজে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লোকদের খোঁজ পেলাম। ঐ লাশ উদ্ধার ও দাফনের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেনঃ জনাব শামসুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বরকল থানা, জয়নাল আবেদীন সাবেক চেয়ারম্যান ভূষণছড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, আব্দুল হামিদ মেম্বার, ভূষণছড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, কাসেম দেওয়ান আনসার / ভিডিপি কর্মকর্তা, আলি আজম প্লাটুন কমান্ডার, ভিডিপি, সাহেব আলী ভিডিপি সদস্য, শামসুল আলম পল্লী ডাক্তার ও ভিডিপি কমান্ডার মীর মোহাম্মদ আবু তাহের মেম্বার ভূষণছড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, ওমর আলী পল্লী ডাক্তার, আঃ হক সরকার সেটেলার গ্রুপ লীডার, আঃ রাজ্জাক সেটেলার গ্রুপ লীডার ও অন্যান্য অনেক।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের মাঝে জনাব শামসুল রহমান ও কাসেম দেওয়ান ছাড়া অন্যান্যরা পরেও সরেজমিনে ঘটনাস্থলে আছেন। তারা সবাই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বক্তা। তাদের বর্ণনাতেই নিহতদের নিম্নোক্ত তালিকা প্রস্তত করা হলো।

১।	নুরুল ইসলাম, পিং রহিম উদ্দিন	১ জন
২।	আবু বকর সিদ্দিক, পিং আঃ রব	১ জন
৩।	শাফিয়া খাতুন, পিং আঃ রব	১ জন

৪। মধুমিয়া, পিং আঃ রহমান	১ জন
৫। ছাদেক আলী, পিং ইমান আলী	১ জন
৬। শহিদ উদ্দিন গং এক পরিবার	৬ জন
৭। আলতামাস, পিং এজাবুল বিশ্বাস গং এক পরিবার	৭ জন
৮। আঃ হান্নান গং এক পরিবার	৭ জন
৯। আজগর আলী গং এক পরিবার	৫ জন
১০। ফজলুর রহমানস গং এক পরিবার	৩ জন
১১। ওমর আলী গং এক পরিবার	৫ জন
১২। আইনুল হক গং এক পরিবার	৫ জন
১৩। রুস্তম আলী গং এক পরিবার	২ জন
১৪। জাকারিয়া গং এক পরিবার	৫ জন
১৫। ওমর আলী (২) গং এক পরিবার	৭ জন
১৬। আঃ শুক্কুর মুন্সি গং এক পরিবার	৫ জন
১৭। সাইফুদ্দিন গং এক পরিবার	৩ জন
১৮। গুল মোহাম্মদ গং এক পরিবার	৭ জন
১৯। আলী আকবর গং এক পরিবার	৩ জন
২০। মোঃ আলী গং এক পরিবার	৩ জন
২১। তোফানী শেখ গং এক পরিবার	৬ জন
২২। আব্দুস সোবহান গং এক পরিবার	৩ জন
২৩। নাসির উদ্দিন পিং ওমর আলী	১ জন
২৪। নিজাম উদ্দিন গং এক পরিবার	৩ জন
২৫। মোস্তফা গং এক পরিবার	৩ জন
২৬। ওমর আলী	১ জন
২৭। মোফাজ্জল হোসেন গং একপরিবার	২ জন
২৮। আব্দুল মোতালেব গং এক পরিবার	৩ জন
২৯। আসমত আলী মাল পিং আহাম্মদ আলী মাল	১ জন
৩০। খলিলুর রহমান, পিং আতাহার হাওলাদার	১ জন
৩১। নুরুল ইসলাম গং এক পরিবার	৩ জন
৩২। জামাল আহাম্মেদ পিং আব্দুল বারী	১ জন
৩৩। মোঃ ইউসুফ শেখ গং এক পরিবার	৫ জন
৩৪। আকবর আলী গং এক পরিবার	৪ জন
৩৫। শাহজাহান গং এক পরিবার	২ জন

৩৬। মোঃ সিদ্দিক মোল্লা পিং ইব্রাহিম মোল্লা ১ জন
৩৭। আসব আলী পিং নজব আলী ১ জন
৩৮। রজব আলী পিং অসিম উদ্দিন ১ জন
৩৯। রবিউল পিং সুন্দর আলী ১ জন
৪০। লোকমান পিং মোঃ আলী ১ জন
৪১। হোসেন ফরাজী পিং ওয়াজ উদ্দিন ১ জন
৪২। সিরাজউদ্দিন গং এক পরিবার ২ জন
৪৩। ওলি মন্ডল পিং হানিফ মন্ডল ১ জন
৪৪। আকলিমা পিং মালুখাঁ ১ জন
৪৫। আসিয়া খাতুন স্বামী আছর আলী ১ জন
৪৬। শামসুদ্দিন গং এক পরিবার ৬ জন
৪৭। কালু মিয়া গং এক পরিবার ২ জন
৪৮। জুছিনা বেগম স্বামী আব্দুল হামিদ ১ জন
৪৯। সিদ্দিক আহমদ গং এক পরিবার ৩ জন
৫০। মুসলেম গং এক পরিবার ৩ জন
৫১। আঃ রাজ্জাক গং এক পরিবার ২ জন
৫২। আঃ রাজ্জাক (২) গং এক পরিবার ৮ জন
৫৩। আঃ হামিদ গং এক পরিবার ৬ জন
৫৪। আঃ হাই গং এক পরিবার ৬ জন
৫৫। সকিনা বিবি গং এক পরিবার ৪ জন
৫৬। আঃ খালেক গং এক পরিবার ৬ জন
৫৭। বেলাল মুন্সি গং এক পরিবার ৬ জন
৫৮। আঃ রউফ গং এক পরিবার ৬ জন,
৫৯। নিজামউদ্দিন গং এক পরিবার ৪ জন
৬০। আইয়ুব আলী গং এক পরিবার ৪ জন
৬১। সুলেমান গং এক পরিবার ২ জন
৬২। আঃ মান্নান গং এক পরিবার ২ জন
৬৩। সুলতান ফরাজি গং এক পরিবার ২ জন
৬৪। নজরুল ইসলাম ও তার ছেলে ২ জন
৬৫। আঃ খালেক ১ জন
৬৬। মোঃ গুলজার ও তার ছেলে ২ জন
৬৭। দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আনুমানিক ১০০ জন

৬৮। ফতেআলী, সুবহান ও নুরুল ইসলাম	৩ জন
৬৯। জসিম উদ্দিন মেম্বারের পরিবার সদস্য	৩ জন
৭০। ইউপি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিনের ছেলে	১ জন
সর্বমোট :	**৩৭০ জন।**

ওয়ারলেসের খবরে ঘটনা অবগত হয়ে, স্থানীয় বিডিআর জোন কমান্ডার প্রথম পরিদর্শক হিসেবে সকাল ৭টায় ভূষণ ছড়া আসেন। তৎপর রাঙ্গামাটি থেকে আর্মির রিজিওন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার আনোয়ার সাহেব হেলিকপ্টার যোগে সকাল ৮-সাড়ে ৮টায় পৌঁছেন এবং তিনি গুরুতর আহত ৮৫ জনকে চট্টগ্রামের সি এম এইচে চিকিৎসার জন্য পাঠান। ঐ আহতদের নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা এখনো জীবিত ও ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, যথাঃ ১, আঃ রব, পিং হাফেজ উদ্দিন, ২। ফিকি বেগম, স্বামী-মোফাজ্জল আলী, ৩। আঃ হাই, পিং একিন মিয়া, ৪। মোজাম্মেল আলী পিং পেশকার আলী, ৫। আবুল হাসেম, পিং-অজ্ঞাত, ৬। তারা বানু, স্বামী-মোজাম্মেল আলী, ৭ । জামাল আহমেদ পিং-আস্রব আলী।

৩১ মে বুধবার ১৯৮৪ এর রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনার দুঃসংবাদে তখনকার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট এরশাদ, তিন দিন পর জুনের ৩ তারিখ শনিবার ভূষণছড়া আসেন। তখনো লাশ দাফন চলছিলো। ভূখা নাঙ্গা, আশ্রয়হীন দর্গতরা, তার আগমনে হাহাকারে ফেটে পড়ে। এই প্রথম তিনি কিছু অনুদান মঞ্জুর করেন এবং লোকদের মৌখিক সান্তনা দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই হুঁশিয়ারী ও উচ্চারণ করেন যে, উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশেধমূলক কিছু করা যাবে না। তাতে তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে, আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। উপদ্রুত উপজাতিরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলে, আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশের বদনাম হবে। বিষয়টি পার্বত্য সমস্যাকে আরো জটিল করবে। যারা মারা গেছে তাদের তো আর ফিরত পাওয়া যাবে না। তবে সমস্যাটির শান্তি পূর্ণ সমাধানে আমরা চেষ্টা করছি। এরূপ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তারও ব্যবস্থা নিচ্ছি। সবাই ধৈর্য্য ধরুন, এবং নতুন করে জীবন শুরু করুন। দুঃস্থদের খাওয়া পরা ও গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হবে। আপাততঃ নদী পারের নিরাপদ ক্যাম্প এলাকাই আপনাদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হলো। পরে বাগান ও কৃষিযোগ্য জমির ব্যবস্থা করা হবে।

এ সবই হলো ক্ষমতাবাদী সান্ত্বনার বুলি। আজ বহু বছর পরও ঐ দুঃস্থ লোকেরা জমি পায়নি। তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল মাদ্রাসা নেই। চিকিৎসা সেবার জন্য কোন হাসপাতাল স্থাপিত হয়নি। জীবন জীবিকা প্রায় শূণ্যের উপর চলে। এরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য জনগোষ্ঠী।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ পাক্যুয়াখালি গণহত্যা

(তাং-রোববার ২১ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

পাক্যুয়াখালি গণহত্যার শোকাবহ স্মৃতি সম্বলিত দিন ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রীঃ। একদল নিরীহ বাঙ্গালী শ্রমজীবি লোককে বিনা কারণে নির্মমভাবে কুপিয়ে আর অঙ্গচ্ছেদ করে, অতি নৃশংসতার সাথে, শান্তিবাহিনী নামীয় উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা জনমানবহীন গহিন অরণ্যের ভিতর হত্যা করেছে। এই নিরীহ লোকেরা সংখ্যায় ছিলো মোট ৩৫ জন। শ্রমই ছিলো তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। রোজি রোজগারের সহজ বিকল্প অন্য কোন উপায় না থাকায় বনের গাছ বাঁশ আহরণেই তারা বাধ্য ছিলো।

বনই হলো সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনীর আখড়া। জীবিকার তাগিদে ঐ হিংস্র সন্ত্রাসীদের সাথে শ্রমিকরা গোপন সমঝোতা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। তারা সন্ত্রাসীদের নিয়মিত চাঁদা ও আহরিত গাছ বাঁশের জন্য মোটা অংকের সালামী দিতো। অনেক সময় মজুরীর বিনিময়ে শান্তিবাহিনীর পক্ষেও গাছ বাঁশ কাটতো, এবং তা খরিদ বিক্রির কাজে মধ্যস্ততা করতো। ব্যবসায়ীরা ও তাদের মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর সাথে যোগাযোগ ও লেনদেন সমাধা করতো। জীবিকার স্বার্থে তারা ছিলো রাজনীতিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক। শান্তিবাহিনীর রেশন ঔষধ পণ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ ও আদান প্রদান এদের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। ঐ বাহিনীর অনেক গোপন ক্যাম্পে তাদের প্রয়োজনে আনাগোনা এবং ওদের কোন কোন সদস্যের ও শ্রমিক ঠিকানায় যাতায়াত ছিলো। এই যোগাযোগের গোপনীয়তা উভয়পক্ষ থেকেই বিশ্বস্ততার সাথে পালন করা হতো। উভয় পক্ষই প্রয়োজন বশতঃ পরস্পরের প্রতি ছিলো বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল। এরূপ আন্তরিক সম্পর্কের কারণে পরস্পরের মাঝে বৈঠক ও যোগাযোগ নিঃসন্দেহে ও স্বাভাবিকভাবে ঘটতো। এ হেতু ৯ সেপ্টেম্বরের আগে মাহাল্যা অঞ্চলের নিকটবর্তী পাক্যুয়াখালি এলাকায় শান্তিবাহিনীর সাথে বৈঠকের জন্য নিহত ব্যক্তিদের ডাকা হয়। আহুত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহেই তাতে সাড়া দেয় এবং বৈঠক স্থলে গিয়ে পৌঁছে।

ঘটনাস্থল পাক্যুয়্যাখালি হলো, মাহাল্যাবন বীটভূক্ত বেশ কিছু ভিতরে পূর্বদিকে গহিন বন ও পাহাড়ের ভিতর জনমানবহীন অঞ্চল। মাহাল্যাসহ এতদাঞ্চল হলো উত্তরের

বাঘাইছড়ি থানা এলাকা। আহুত লোকজন হলো দক্ষিণের ও নিকটবর্তী লংগদু থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের কিছু লোক হলো আদি স্থানীয় বাঙ্গালী আর অবশিষ্টরা হাল আমলের বসতি স্থাপনকারী। এই সময়কালটাও ছিলো শান্ত। স্থানীয়ভাবে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিরোধ নিয়ে তখন কোন উত্তাপ উত্তেজনা ছিল না। এমন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রতিশোধমূলক ও হিংসাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটার কার্যকারণ ছিলো অনুপস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দাঙ্গা হাঙ্গামা চাঁদাবাজি ছিনতাই অগ্নিসংযোগ হত্যা উৎপীড়ণ অহরহই ঘটে। তার কার্যকারণ ও থাকে। রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা ছাড়াও স্বার্থগত রেষারেষি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি জাতিগত প্রতিশোধ পরায়ণতাকে সহিংসতার কারণ রূপে ভাবা যায়। কিন্তু আলোচ্য সময়টিতে অনুরূপ পরিবেশ ছিলো না। তাই সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে নৃশংস ঘটনাটি ঘটে যায়। খবর পাওয়া গেলোঃ বৈঠকের জন্য উপস্থিত শ্রমিকদের একজন বাদে অপর কেউ জীবিত নেই, নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। হাহাকারে ছেয়ে গেলো গোটা এলাকা। তাদের খুঁজে সেনা পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও পাবলিকদের যৌথ তল্লাসী অভিযানে পাকুয়্যাখালির পাহাড় খাদে পাওয়া গেলো ২৮টি বিকৃত লাশ। বাকিরা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছেন। এখনো তাদের সন্ধান মিলেনি। পালিয়ে প্রাণে বাঁচা একজনই মাত্র যে এই গণহত্যা খবরের সূত্র।

এটি কার্যকারণহীন নির্মম গণহত্যা। এটি মানবতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ।

ন্যায় বিচার ও মানবতা হলো বিশ্ব সভ্যতার স্তম্ভ। জাতিসংঘ এ নীতিগুলো পালন করে। তাই তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানদের হাতে গণহত্যার শিকার ইহুদীদের পক্ষে এখনো বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এখনো ঘোষিত অপরাধীদের পাকড়াও করা হয়ে থাকে। অধুনা যুগোস্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত গৃহযুদ্ধে গণহত্যার নায়কদের পাকড়াও বিচার অনুষ্ঠান ও শস্তি বিধানের প্রক্রিয়া চলছে। কম্বডিয়ায় অনুষ্ঠিত পলপট বাহিনীর গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়াটিও জাতিসঙ্ঘ ও কম্বডিয়া সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই বিচার তালিকায় পাক্যুয়াখালি, ভূষণছড়া ইত্যাদি গণহত্যাগুলো অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য। সভ্য জগতে উদাহরণ স্থাপিত হওয়া দরকার যে, মানবতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অপরাধ অবশ্যই বিচার্য। সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতি তা অবহেলা করলেও জাতিসঙ্ঘ তৎপ্রতি অবিচল।

স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার দাবী দাওয়ার পক্ষে, পরিচালিত রাজনীতি, আন্দোলন ও সশস্ত্র তৎপরতায়, নির্বিচারে গণহত্যা কোন মতেই অনুমোদন যোগ্য নয়। এখন স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশে গণহত্যার অভিযোগগুলো যাচাই করে দেখা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ বিচারযোগ্য ঘটনা অনেকই আছে ও তার বিচার অবশ্যই হতে হবে। সাধারণ ক্ষমার আওতা থেকে গণহত্যার অপরাধটি অবশ্যই বাদ যাবে।

পার্বত্য ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে, আমার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ হলোঃ এই

পর্বতাঞ্চলের প্রতিটি দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, ছিনতাই, চাঁদাবাজী, হত্যা ও পীড়নের অগ্রপক্ষ হলো জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো। বাঙ্গালীরা তাতে পাল্টাকারী পক্ষ মাত্র। এমতাবস্থায় জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ হলেন আসল অপরাধী। মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠনে তাদের নির্দেশ ও অনুমোদন না থাকলে, তারা প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে অবশ্যই দমাতেন বা শাস্তি দিতেন। পাক্যুয়াখালি ঘটনা তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়নি, অনুরূপ অস্বীকৃতি আমলযোগ্য নয়। কারণ অনুরূপ ঘটনা ঘটাবার দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এই আমলে অত্রাঞ্চলে উপস্থিত নেই। ভূক্তভোগীপক্ষ একমাত্র তাদেরকেই তজ্জন্য দায়ী করে। তাদের অস্বীকারের অর্থ নিজেদের সংগঠনভূক্ত অপরাধীদের অপরাধ ঢাকা। সুতরাং জনসংহতি নেতৃবৃন্দই অপরাধী।

এখন গণহত্যার অভিযোগটি বিদ্রোহী সংগঠনের প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার উপরই পতিত হয়। তিনি অপরাধী না নির্দোষ তা বিচার প্রক্রিয়াতেই নির্ধারিত হবে।

আমরা আইন শৃংখলা মান্যকারী সাধারণ মানুষ, সরকারের কাছে এই দাবী করছিঃ পাক্যুয়াখালি সহ অন্যান্য গণহত্যার বিচার হোক। আন্তর্জাতিক আইন হলোঃ গণহত্যা ক্ষমাযোগ্য নয়। যদি পাকুয়্যাখালি ভুষণছড়া ও অন্যান্য ঘটনাকে গণহত্যা রূপে ধরে নিতে সন্দেহ থাকে, তা হলে আন্তর্জাতিক মানে এর যথার্থতা যাচাই করা হোক। আমরা বিচার চাই, অবিচার নয়।

সন্তু বাবু এখন সরকারের নিরাপদ পক্ষপুটে আশ্রিত। তাই বলে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না, এমন পক্ষপাতিত্ব ন্যায় বিচারের বিরোধী। সন্তু বাবু নিজেকে নিরপরাধ মনে করলে, সরকারের পক্ষপুট ছেড়ে বিচার প্রক্রিয়ার কাছে নিজেকে সোপর্দ করুন। নিরপরাধ স্বজাতি হত্যার অনেক অভিযোগ ও তার বিরুদ্ধে ঝুলে আছে। অধিকার আদায়ের সংগ্রাম মানে তো, মানুষ হত্যার অবাধ লাইসেন্স লাভ নয়। মানবতাবাদী সংগঠনের হিসাব মতে তাদের হাতে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার স্থানীয় আধিবাসীর প্রাণনাশ ঘটেছে। এটি গুরুতর অভিযোগ।

গৃহবধু ফাতেমা হত্যা ও অন্যান্য ঘটনা

রাঙ্গামাটি রিজিয়নের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব মাকসুদুজ্জামান আমাকে ঐ অঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লেখতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ তাঁর উদ্যোগে নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের তরিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে উপদ্রুত মারিশ্যায় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হতে পারেনি। নয়ত মহালছড়ির মত আরেকটি লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যেতো।

উল্লেখ্য যে, গত ১০ই এপ্রিল ২০০৪ দুপুরে গরু চরানরত অবস্থায় মধ্যবয়সী বাঙ্গালী মহিলা ফাতেমা বেগম উপজাতীয় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা বনময় এক টিলায় ধর্ষিত ও নিহত হয়। তার লাশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীদের মিছিল, মিটিং ও মামলা শেষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যবর্তী অবস্থান হেতু, বাঙ্গালী ও উপজাতিদের পারস্পরিক দাঙ্গা ও ধ্বংসজজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে এটি কেবল ফাতেমা হত্যা নয়, আরো কিছু ঘটনার সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়াজাত বৃহত্তর উত্তেজনা, যাকে হাল্কা ভাবার অবকাশ নেই। প্রশাসন ঘটনাগুলোর প্রতিকার মুলক ব্যবস্থা গ্রহণে যথেষ্ট সক্রিয় নন। উপজাতীয় দুস্কৃতিকারীরা শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের হোতা হলেও, তাদের প্রতি প্রশাসন নমনীয়।

স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এ ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে বেশ কিছুদিন খবর আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই মৌখিকভাবে উপজাতীয়দের পক্ষ থেকে প্রথমে প্রচারিত হয় যে, স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পের অদূরে প্রাপ্ত লাশ হত্যার দায় উপজাতীয়দের নয়, কোন বিডিআর সদস্যেরই কান্ড হবে। তৎপর তাদের দ্বারা দ্রুত প্রচারিত হয় যে, মহিলাটির স্বামীও জনৈক ওসমান কর্তৃক হত্যাকান্ডটি সংঘটিত। তাদের দ্বারা আবার বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় যে, ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত রক্ত মাখা দাটি বাঙ্গালী ব্যবহৃত বাঁকা দা, উপজাতীয়দের ব্যবহৃত টাকল নয়, যা কোন বাঙ্গালী কর্তৃক হত্যাকান্ডের আলামত। এটাও বলা হতে থাকে যে, কথিত ওসমান ঐ সময় ঘটনাস্থলে ছিলো এবং সেই চিৎকার দিয়ে হত্যা ঘটনার সংবাদ প্রচার করেছে। সুতরাং সেই হত্যাকান্ডের নায়ক। এই সাথে মুখ রোচক সংবাদ রটে : মহিলার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী ছিলো। সে-ই পথের কাঁটারূপী স্ত্রীর ঘাতক। আরেক গল্প হলো; ওসমানের সাথে মহিলাটির প্রেম ছিলো। তারা এক সঙ্গে ঐ বনে অভিসারে গেছে। সম্ভবতঃ তাদের মাঝে মনোমালিন্য ঘটায় ওসমান কর্তৃক প্রেমিকা নিহত হয়েছে। সংবাদ ও রটনার এই পার্থক্যে আমি বিভ্রান্ত বলে ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে বলি। সরেজমিনে বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করা দরকার। সুতরাং এ কাজেই আমি ১৬ই মে বিকালে মারিশ্যা পৌছি।

ঘটনার যাঁচাই বাছাই ঃ

আমি স্থানীয় বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ আর সাধারণ লোকজনের মুখোমুখি হই। বাঙ্গালী ভুক্তভোগী পাড়া মুসলিম ব্লক, বিডিআর ক্যাম্প আর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি, সর্ব সাধারণের বক্তব্য শুনি

এবং পত্র পত্রিকায় প্রচারিত খবর, গুজব আর গল্প সমূহ যাচাই বাছাই করি। এই সাথে প্রকাশ পায় বাঙ্গালীদের ক্ষোভ অসন্তোষ আর উত্তেজনার কারণ কেবল ফাতেমা হত্যার ব্যাপার নয়, আরো বহুবিধ দুস্কর্ম, যা স্থানীয় পাহাড়ীদের দ্বারা সংঘটিত।

এই পাড়ারই সম্ভ্রম হারা ও নির্যাতিতা বেশ কিছু মহিলা অভিযোগ জানালেন যে, তারা অতি দরিদ্র মানুষ। অধিকাংশ হয় ভূমিহীন না হয় দশ বিশ শতক জমির মালিক। তাদের স্বামীরা জীবিকার জন্য শ্রমিকের কাজ ও বর্গায় জমি চাষ করে। তাতে সংসার চলে না, তাই তারাও পাহাড় বনে শ্রম দেয় ও লাকড়ি কাটে। তাদের অনেকে গরু ছাগল পালে ও চরাতে পাহাড়ে বনে ও মাঠে যায়। তাদের গরু ছাগলে যাতে কারো ক্ষেত নষ্ট না করে তজ্জন্য তাদের প্রহরায় থাকতে হয়। নিজেদের পাড়া এলাকায় বন ও গোচারন ভূমি নেই, এবং অধিকাংশ অনাবাদি বনাঞ্চল, পাহাড়ী পাড়ার কাছাকাছি, তাই ওদিকে তাদের যেতে হয়। পাহাড়ী দুস্কৃতিকারীরা এটাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে, কখনো শুকর বা হরিণ শিকারের নামে আর কখনো একা অতর্কিতে তাদের উপর হামলে পড়ে। এভাবে তাদের সম্ভ্রম লুট বা বাধা দিলে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। প্রতিবেশী হিসাবে দুস্কৃতিকারীরা তাদের পরিচিত। মামলার ঝামেলায় না গিয়ে তাদের উপজাতীয় মুরব্বীদের কাছে বিচার চাইতে হয়। তাতে মাঝে মধ্যে বিচার আর দোষীদের শাস্তিও হয়। কিন্তু অধিকাংশ সম্ভ্রম হানির ব্যাপার, সংসার রক্ষা ও সামাজিক লজ্জা ঢাকার প্রয়োজনে, অনালোচিতই থেকে যায়। যাদের সম্ভ্রম ও সম্মান হানির ব্যাপার প্রচারিত হয়ে যায় তাদের তো আর গোপন করার কিছু থাকে না। বিষয়টির সুরাহার প্রয়োজনে সেই তারা মুখ খুলে। দেশ ও জাতির কাছে তারা এর বিচার প্রার্থী। এই বক্তব্য দাতারা হলেন ঃ (১) হাজেরা খাতুন (৩৫), (২) আলিমুন্নেছা (৪০), (৩) ওজুফা খাতুন (৪০), ও (৪) খুদেজা (২৫) (এরা দুজন মা ও মেয়ে) এবং (৫) শমেলা খাতুন (৩০)। এদেরসবার বাড়ি মুসলিম ব্লক, মারিশ্যা, উপজেলা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি।

নিহত ফাতেমাসহ একই পাড়ার বাসিন্দা এই ছয় মহিলা ছাড়াও আরো অনেকে আছে, যারা সংসার ভাঙ্গা ও সমাজে মান হানির ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ। প্রতিবেশী উপজাতীয়দের দ্বারা বাঙ্গালী মেয়েদের এরূপ সম্ভ্রম হানি ও নির্যাতন এই পাড়ায় মাত্র সীমাবদ্ধ নেই। সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের এটি একটি চিত্র।

এরপর একদল বাঙ্গালী কাঠুরে ও আরাকশী তাদের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা নিয়ে রীতিমত হাহাকার শুরু করে দিলেন। তারা ভূহীন অথবা স্বল্প বিত্তের মালিক দরিদ্র লোক। গাছ, বাঁশ, ছন, লতা-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে তারা রোজি রোজগারে বাধ্য। বন ও পাহাড়ে না গেলে তাদের জীবিকা নির্বাহ চলে না। উপজাতীয়, পাড়া এলাকা ডিঙিয়ে তাদের বন ও পাহাড়ে যেতে হয়। তখন চাঁদা বাজদের চাঁদা দিতে হয়। সরকারী খাস ও বেদখল হওয়া সংরক্ষিত বন এলাকার পরিত্যক্ত জুম ক্ষেত্রের আধা পোড়া বাঁশ গাছ সংগ্রহ কালে সেগুলোর উপজাতীয় দাবীদারদের মুল্য দিতে হয়। চিরা কাঠ, সংগৃহীত বাঁশ, ছন, লতা-পাতা তাৎক্ষনিক নিয়ে আসতে না পারলে, পরের দিন তা আর পাওয়া যায় না। কোন উপজাতীয়ের বাড়িতে তার খোঁজ

পেলে তা বিনা মুল্যে ফেরত পাওয়া যায় না। একা ও নির্জনে কোন উপজাতীয়ের পাল্লায় গেলে, ছিনতাই কবলিত হতে হয়। প্রতিরোধ দিলে হতাহত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

এই পাড়ারই অনেকে অনুরূপ ভাবে নিহত হয়েছেন। তারা হলেন ঃ মুড়ি বেপারী আঃ ছামাদ ও তার দুই ছেলে। নিহত ফাতেমার ভাসুর আঃ রব, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ ইসহাক, মোঃ দেলোয়ার, মোঃ খুর্শেদ। এই খুর্শেদের যুবতী বোন জাহেদা খাতুন (১৮) উপজাতীয় পাড়া এলাকা থেকে অপহৃত ও নিখোঁজ। আরো নিখোঁজ হলো গরু বেপারী মোঃ ফজলু, হাড়ি পাতিলের ফেরিওয়ালা মোঃ মুসলিম, শিশু মুসলিম, মুফজ্জল আহমদ ও তার ছেলে, জাহেদুল ও তার বাবা ইদ্রিস এবং অন্যান্য অনেকে। সারা পার্বত্য অঞ্চলের এটি একটি চিত্র মাত্র।

ওসমান গণিসহ অনেকের অভিযোগ ঃ

উপজাতীয়দের হুমকি ও আক্রমনের ভয়ে তারা দূরের ও উপজাতীয় পাড়ার কাছাকাছি জমির পাকা ধান, শাক সবজি, মরিচ ইত্যাদি তুলে আনতে পারছেন না। সাধারণ পাড়াবাসীর অভিযোগ ঃ তারা হত দরিদ্র লোক, গাছ, বাঁশ, ছন, লতা-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহে বনে ও পাহাড়ে যেতে পারছেনন না। ফলে তাদের রোজি রোজগার বন্ধ। বাঙ্গালী এলাকা ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। এর বাহিরে চতুর্দিকে বিস্তৃত পাহাড়ী বসতি ও খাস বন পাহাড় ও সংরক্ষিত এলাকা। তাই দরিদ্র বাঙ্গালীরা এখন প্রাণের ভয়ে গৃহবন্দী। মাঠ ও গৃহ কর্মে শ্রম দেওয়ার প্রধান ক্ষেত্র হলো বন পাহাড় ও উপজাতীয় এলাকা। এখন নিরাপত্তার অভাবে সে কর্ম সংস্থান বন্ধ। সুতরাং দরিদ্র বাঙ্গালী সমাজে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে।

এখন মুল ফাতেমা হত্যার ঘটনার শোনানী শুরু হলো। প্রথম বক্তা ফাতেমার স্বামী আং ছামাদ, বয়স-আনুমানিক ৫০। সে শ্রমজীবি, মধ্যবয়সী দরিদ্র লোক, মাত্র বিশ শতক জমির মালিক। দুই মেয়ে ও এক ছেলের বাপ। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে এখন সে নানা। ছেলে আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এই সংসার চালাতে তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে শ্রম দিতে হতো। স্ত্রী গরু, ছাগল পালন পোষন চরানো, লাকড়ি কুড়ানো আর গৃহস্থালী কাজের দ্বারা সংসার চালাতে ভূমিকা রাখতো। ১০ই এপ্রিল তারিখে কোন শ্রমের সংস্থান ছিলো না, তাই দুপুর ১১টার দিকে ভাত খেয়ে, স্বামী সামনের দোকানে গিয়ে আড্ডা দিতে বসে। আর স্ত্রী ফাতেমা বেগম গরু চরাতে বেরিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, এখন ক্ষেতে পাকা ধান ও শাক সবজি থাকায়, গরু ছাগলের দ্বারা নষ্ট হবার ভয়, তাই গরু ছাগলের পাহারায় থাকতে হয়। আং ছামাদ পাড়ার দোকানে আড্ডা দেয়াকালে, নিকটবর্তী তূলাবান পাড়াবাসী স্নেহ কুমার চাকমা গং ১১/১২ জন উপজাতীয় লোককে দা, বল্লম ও জাল সহ পূবের বনময় পাহাড়ে শুকর ও হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে এ পথে যেতে দেখে। তাদের সাথে সে কথাও বলে। সবাই পরিচিত প্রতিবেশী। আনুমানিক ১টা ১ টার দিকে পাড়ায় ব্যাপক হুলস্থুল উঠে যে, বিডিআর ক্যাম্পের অদূরে এক বাঙ্গালী মহিলা খুন হয়েছে। আমার স্ত্রীও সে দিকে গরু চরাতে গেছে, তাই আশংকিত অবস্থায় আমিও সেদিকে দৌড়ে যাই, এবং বিডিআর ক্যাম্পের দক্ষিণ পূর্বের মুজিবুরের টিলা ও তোতার

টিলার মাঝামাঝি ঢালুতে বনের ভিতর আমার স্ত্রীর লাশটি পড়ে থাকতে দেখি। তার মাথা ও মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিলো। পরে পুলিশ, বিডিআর ও গ্রামবাসীর দ্বারা লাশ উদ্ধার করে আনা হয়। ঘটনাস্থলে, একটি উপজাতীয় দা (টাকল) একটি ঘড়ি ও একজোড়া স্পঞ্জের সেন্ডেল পাওয়া যায়। আমি নয়জন উপজাতীয়কে আসামী করে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করি। এই সন্দেহভাজনরা আমার সামন দিয়েই ঘটনাস্থলের দিকে শিকারে গেছে। এটা মিথ্যা কথা যে, আমি দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী ছিলাম এবং তা নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য ছিলো। উপস্থিত পাড়াবাসী ও সাক্ষ্য দিলেন যে, ফাতেমা ও তার স্বামীর মাঝে কোন মনমালিন্য ছিলো না। মহিলাটির স্বভাব চরিত্র ভালই ছিলো। তার সাথে কারো প্রেম ভালবাসা বা দৈহিক সম্পর্ক থাকা অবিশ্বাস্য।

দ্বিতীয় বক্তা ওসমান গণি। বয়স আনুমানিক চল্লিশ। সরল সোজা, ছোট খাটো স্বাস্থ্যহীন গরীব মানুষ ও দুই সন্তানের জনক। এই পাড়ারই বাসিন্দা। সে দুটি গরু চরাতে ঘটনাস্থলের দক্ষিণে, একটি ধান ক্ষেতের পাহারায় ছিলো। সে জানতো না নিকটবর্তী কোন স্থানে ফাতেমা বেগমও গরু চরাচ্ছে। গরুর গলার ঘন্টির আওয়াজ না পেয়ে তার সন্দেহ হয় ঃ গরুগুলো অন্য কোথাও চলে গেলো কিনা, বা কারো ক্ষেত নষ্ট করছে কিনা। তখন বেলা দুপুর একটা কি দেড়টা। সে বলে ঃ আমি গরু খোঁজা কালে কিছু দুরে দেখতে পাই, এক মহিলার লাশের পাশে দু'জন উপজাতীয় লোক, যাদের একজন স্নেহ কুমার চাকমা, সে রিটায়ার্ড বিডিআর সদস্য। তাদের একজনের হাতে একটি বল্লম ও অন্যজনের হাতে একটি দা। আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে বিপরীত দিকে দৌড় দেই, বিডিআর টিলার দক্ষিণের সমতলে এসে পড়ি, এবং লাশ লাশ বলে চিৎকার দিতে থাকি। তাতে পাশের পাড়া মুসলিম ব্লকের বাঙ্গালী নারী পুরুষ মিলে বহু লোক এসে জড়ো হয়। আমি ঘটনাস্থলের দিক নির্দেশ করলে তারা গিয়ে লাশটিকে ফাতেমা বেগমের বলে সনাক্ত করে এবং পুলিশ ও বিডিআরের উপস্থিতিতে উদ্ধার করে আনে। উপস্থিত জনতা আমাকে সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুলে।

অতঃপর আমি লাশ উদ্ধারকারী জনতার সাক্ষ্যে নিশ্চিত হই ঃ ওসমান গণি তখন ভীত সন্ত্রস্থ ছিলো এবং তার গায় বা কাপড়ে কোনরূপ রক্তের চিহ্ন ছিলো না। এই পর্যায়ে আমি বিডিআর ক্যাম্প ও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে রওয়ানা হই। ক্যাম্পটি বাঙ্গালীপাড়া ও উপজাতীয় পাড়ার মাঝামাঝি দুই আড়াইশ ফুট উঁচু খাড়া টিলার মাথায় অবস্থিত। এই বৃদ্ধ শরীর নিয়ে বহু কষ্টে সেখানে উঠে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমার সাথী কয়েকশ লোক আর বিডিআর সদস্যদের সেবা যত্নে আমি কিছুক্ষণের ভিতর প্রাণ ফিরে পাই। তৎপর ঘটনাস্থল সেখান থেকেই অবলোকন করে ফিরে আসি।

আমি নিশ্চিত হই, উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের অভিযোগ ও বিক্ষোভ অমূলক নয়। প্রশাসনের দ্বারা চেপে দেওয়া শান্তি ও স্থায়ী হবার নয়। এটা দুঃখজনক যে, অপরাধ দমন আর অপরাধী পাকড়াও কাজে প্রশাসন তেমন সক্রিয় নয়। শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে উভয় সম্প্রদায়কেও সক্রিয় হতে হবে। অপরাধ ও অপরাধীদের প্রশ্রয় দিলে, মানবিক

জীবন যাপন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জবরদস্তি শান্তি চাপিয়ে দিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন শেষ করা সঠিক নয়। মানুষের জীবন যাপনের জন্য নিরাপদ রোজি রোজগার ও চলাফেরার ব্যবস্থা থাকাও জরুরী, এটাও প্রশাসনিক দায়িত্ব। এটা সঠিক নয় যে, মারিশ্যার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কারো উস্কানী প্রসূত। এই অঞ্চলকে সবার জন্য শান্তিপূর্ণ বাসযোগ্য করতে হলে দুষ্কর্ম আর দুস্কৃতিকারীদের দমাতেই হবে। প্রশাসনের সাথে সাথে সমাজপতি ও মুরব্বীদেরও সক্রিয় হতে হবে। কিছু কিছু ঘটনায় উপজাতীয় মুরব্বীরা অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছেন এবং বাঙ্গালী মুরব্বীরাও আতঙ্কগ্রস্ত পাহাড়ীদের নিজেদের বাড়ী ঘরে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন, অথবা নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়েছেন। এটা প্রশংসনীয় মানবতাবাদী কাজ। অনুরূপ কর্মকাণ্ডকে প্রশাসনিকভাবে উৎসাহিত করা দরকার। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অপরাধকে অবহেলা আর অপরাধীদের ছাড় দেয়া মোটেও উচিত নয়। ফাতেমা হত্যার মাসাধিককাল পার হলেও, অপরাধী পাকড়াও না করা দুঃখজনক। এটা অপরাধ ও অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল। উপজাতীয়রা তাতে উত্তেজিত আর মারমুখী হয়ে উঠবে, এই আশংকার কথা যুক্তি সঙ্গত নয়। শান্তিকামী আর আইন শৃঙ্খলা মান্যকারী উপজাতীয়দের প্রতি তাতে অবিচার করা হচ্ছে। মনে মনে তাদের সবাইকে উশৃঙ্খল অরাজক ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। পুলিশ নিজেদের দুর্বল ভাবলে, বিডিআর এর সাহায্যে অভিযান চালাতে পারে। তাদের সশস্ত্র বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা সত্য প্রমাণিত হলে, এটাও হবে শিক্ষনীয় বিষয়।

এটা বিস্ময়কর যে কর্মকর্তা পর্যায়ে স্বস্তি প্রকাশ করা হয় ঃ ফাতেমা বেগম ধর্ষিত হয়নি। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে তা আসেনি। বাঙ্গালী পক্ষের এই অভিযোগ সঠিক নয়। মনে হয় তাদের দৃষ্টিতে হত্যার চেয়ে ধর্ষণই বড়। বাঙ্গালী পক্ষের অভিযোগ ঃ ধর্ষণের রিপোর্ট চাওয়াই হয়নি। প্রশাসন হত্যাকান্ড আর ধর্ষণকে ধামাচাপা দিতে আর উপজাতীয় আসামীদের বাঁচাতে সচেষ্ট। এই পর্যায়ে বাঙ্গালীদের প্রশ্ন ঃ আমরা বিচার পাচ্ছি না, এখন কি করব? এর উত্তর আমি দিতে পারি নি।

বাবু ছড়া ঘটনার বর্ণনা অবিশ্বাস্য

(তাং-রোববার ২৩ কার্তিক ১৪০৬ বাংলা ৭ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

অনেক সত্য ঘটনা বর্ণনার দোষে অবিশ্বাস্য হয়ে যায় । প্রমাণ ও যুক্তির অভাবে অনেক বাস্তব ঘটনাও বিচারের কষ্টি পাথরে প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং তা থেকে অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যায় । ঘটনা ঘটলেও প্রমাণ ও যুক্তির অভাবে, অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়া যায় না । ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো ঘটনা বা অতিরঞ্জিত ঘটনায় এমন কিছু আলামত থাকে, যদ্বারা বিচারালয় ও নিরপেক্ষ ন্যায়বাদী লোকদের বুঝে নিতে সহায়তা হয় যে, ঘটনাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সাজানো । বাবু ছড়ার কথিত ঘটনাটির ভিতরও এমন কিছু আলামত আছে, যদ্বারা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ঘটনাটি যেমন করে বর্ণিত হয়েছে, আদৌ তেমন কিছু নয় । সম্ভবতঃ কোন ভিন্ন ঘটনা বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কথিত বর্ণনাটি সাজান হয়েছে । ঘটনাটির ভিতর বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাস্তবতা নেই ।

যেন তেন ভাবে কোন ঘটনা আদৌ ঘটে না । তার একটি কার্যকারণ ও পশ্চাত ভূমিকা অবশ্যই থাকে । তদুপরি মানবিক আচরণ ও পাশবিক আচরণ সম চরিত্রের হয় না । মানুষ যতই জঘন্য চরিত্রের হোক, সে ঘৃণিত অপরাধমূলক কাজগুলো রেখে ঢেকে বা গোপনে করে । বিশেষতঃ যৌনতা ও হৃদয়বৃত্তি সংক্রান্ত ঘটনা গোপনে ও একান্তেই সংঘটিত হয় । মানুষ লজ্জ্যাবোধ, শালিনতা ও নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হয় । এমন জঘন্য মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়, যে লজ্জ্যা, শালিনতা, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাকে পরোয়া করে না । এর বিপরীত কাজ হলো পাশবিক আচরণ । একমাত্র পশুই প্রকাশ্যে শৃঙ্গার ও যৌনাচার করতে পারে । তার কোন লজ্জ্যা ও শালিনতা বোধ নেই । হ্যাঁ কোন পাগল ব্যক্তির ও লজ্জ্যাহীন আচরণ করতে বাঁধে না । তার মাঝে ও পশুতে কোন তফাৎ থাকে না ।

প্রাচ্য সভ্যতার অন্যতম গুণ হলোঃ এখানে স্বামী স্ত্রী হলেও কেউ প্রকাশ্যে শৃঙ্গার ও যৌনাচার করে না । নির্লজ্য বেশ্যা ও তাদের দোসররাও, রাখ-ঢাক মেনে চলে । এ হলো মানব চরিত্র বিচারের সূত্র ।

কথিত বাবুছড়া ঘটনার ভিতর এই যুক্তিমত্তা নেই । প্রকাশ্য দিবালোকে, হাজার হাজার হাটুরেদের ভীড়ের ভিতর, একজন ইউনিফর্ম সজ্জিত সেনা সদস্য, তার সঙ্গী সহযোগীদের সহ, শান্তি শৃঙ্খলার কাজে টহলদানরত অবস্থায়, একজন চাকমা যুবতীর যৌনাঙ্গে হাত

দিবে, আর তাতে যৌন সুখ উপভোগ করবে, একি স্বাভাবিক ঘটনা? যারা এ ঘটনাটি বিশ্বাস করাতে চায়, তারা কি খোদ অনুরূপ ঘটনায় পারঙ্গম? যার বিরুদ্ধে এ জঘন্য অভিযোগটি উঠেছে, সে বাংলাদেশের সর্বাধিক সুশৃংখল একটি বাহিনীর সদস্য। সে বাহিনীর চাকুরী অতি লোভনীয় হলেও সামান্য শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে সর্বাধিক ঠুনকো। শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি হলো মুহূর্তে চাকরীচ্যুতি। আর অভিযোগ গুরুতর হলে, তজ্জন্য কোর্ট মার্শাল জাতীয় সংক্ষিপ্ত বিচারানুষ্ঠান হয়। তাতে কেবল চাকুরী যায়না, জরিমানা সশ্রম কারাদন্ড আর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হয়েও থাকে। এই বিচার ব্যবস্থায় নির্দোষ খালাসের সুযোগ অতি বিরল। তাতে কোন অনুকম্পাও নেই। এই ভয়ংকর পরিণতির পাশাপাশি একজন কর্মরত সৈনিক, ভালকরেই ওয়াকিবহাল থাকেন যে, পার্বত্য অঞ্চল সহ দেশে এখন সেনা শাসন নেই। পার্বত্য অঞ্চল এখন সেনা উপস্থিতির বিরুদ্ধে উত্তপ্ত। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার প্রক্রিয়াধীন আছে। এখন সেনা টহল ও তৎপরতা কেবল প্রশাসনের আহবানে প্রয়োজনীয় শান্তি শৃংখলা রক্ষার স্যায়তায় পরিচালিত হয়। স্বউদ্যোগে সেনাবাহিনী কোন তৎপরতা পরিচালনা করে না। এই কঠিন নিয়ন্ত্রণ, ভয়াবহ পরিণতি, আর নিষেধকে, অমান্য করার দুঃসাহস কোন সেনা সদস্যের থাকতে পারে না। সুতরাং এই বিরূপ পরিস্থিতিতে তথাকথিত ঘটনাটির এমনভাবে ঘটা অসম্ভব।

হ্যাঁ এমনটি না হয়ে, ভিন্ন কোন ঘটনা আকস্মিক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটতে পারে, আর সে হলো হাজারো লোকের ভীড়ের মাঝে গায় চাপ বা ধাক্কা লাগা, যা হাটুরে মেয়ে পুরুষের মাঝে অহরহই ঘটে। এটা ইচ্ছাকৃত শ্লীলতাহানি নয়। তাকে কেউ গুরুতরভাবে নেয়ও না। অধিকাংশক্ষেত্রে এসব ঘটনাকে অবহেলা করা হয়। তাতে কিছু কিছু ঠাট্টাও চলে। খোশ মিজাজী রসিক মহিলা হলে, পথ আটককারী বৃদ্ধকে ঠাট্টাচ্ছলেই ঠেলে দিয়ে বলেঃ সরনা আজু। ঘরত গেলে বউ লবে। মুই এক্কে ন জিনোঙ্গোর। যুবকদের উদ্দেশ্যেও কেউ কেউ এমনি রসাল বাক্য ছুঁড়ে থাকে।

তবে আজকাল বাঙ্গালী পাহাড়ীদের পরস্পরের মাঝে এরূপ রসালো নিষ্কলুষ সম্পর্ক নেই। সেটেলার ও সেনা সদস্যদের উপর পাহাড়ীরা চরমভাবে বিদ্বিষ্ট। এই বিদ্বেষ ও হিংসা, বিদ্রোহেরেই চরমপন্থী প্রতিফলন। অথচ বিদ্রোহই আমদানী ঘটিয়েছে সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের। এই কার্যকারণটি ভুলে যাওয়ার বিষয় নয়।

চুক্তি আর অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এটা আনন্দজনক। তবে তাতে কি এখনই অশান্তি আর বিদ্রোহের স্থায়ী সমাধান হয়ে গেছে বলাও আশ্বস্ত হওয়া যায়? বেআইনী অস্ত্রবাজি, চরমপন্থী তৎপরতা, সন্ত্রাস ও বিপ্লবী সশস্ত্র রাজনীতি, এখনো নির্মূল হয়নি। চুক্তি পক্ষের উপজাতিরা এখনো সাম্প্রদায়িক হুমকি ধমকিতে সোচ্চার। চুক্তিভুক্ত আকাঙ্খিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, গণতন্ত্র, সার্বজনীন কল্যাণ, আইন মান্যতা ও অখন্ড স্বাদেশিকতার শর্ত উপজাতিরাই ভঙ্গ করছেন। বাঙ্গালীরা স্বদেশী ভাই, আর সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত জাতীয় অস্তিত্বের অপরিহার্য্য খুঁটি, এই উদার মনোভাবের প্রতিফলন, উপজাতীয় সমাজে না ঘটা পর্যন্ত, তাদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত

হওয়ার উপায় নেই।

অভাব অভিযোগের অতিরঞ্জন, আর বিদ্বেষ বশতঃ সেনা সদস্য ও বাঙ্গালীদের ঘায়েল করার প্রবণতাই, প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে ও তার যথোপযুক্ত প্রতিকারে বাধা দিচ্ছে। সাধারণতঃ কেউ অন্যায় অনাচার ও উৎপীড়ণের পক্ষপাতী নয়। প্রতিকার আর ন্যায় বিচার করতে হলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের উপস্থিতি থাকতে হবে। জবরদস্তি ও হিংসার দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালীদের উপর উপজাতিরা ক্ষিপ্ত। তাদের তাড়াতে উপজাতিরা আন্দোলনে লিপ্ত। এই লক্ষ্য অর্জনকে সফল করারই সহায়ক কাজ হলো, যৌক্তিক অযৌক্তিক প্রতিটি উপায়ে সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালীদের অবস্থানকে কলুষিত করা। নারী কেলেঙ্কারীর অভিযোগটি হলো প্রতিপক্ষকে দুর্বল ও ঘায়েল করার সর্বাধিক স্পর্সকাতর হাতিয়ার। সহানুভূতি আদায়ের এটা একটি নাজুক অস্ত্র। দেশে বিদেশে চরিত্রহানিতে এই অস্ত্রটি ত্বরিত কার্যকর। এটির ব্যাপক ব্যবহার অতীতেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

এই অভিযোগটি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও ষড়যন্ত্রের ফল, তার দ্বিতীয় প্রমাণ হলোঃ অভিযুক্তদের নামধাম পদবি সবই উপজাতীয় প্রতিবাদীদের মুখস্ত। অথচ সৈনিকরা জন বিচ্ছিন্ন ক্যাম্প জীবনে আবদ্ধ লোক। বৈরী উপজাতীয় মেলামেশা থেকে তারা স্বভাবতঃ বিরত। দাঙ্গা ও হানাহানি কালে বেজ দেখে তাদের নাম পদবি মুখস্ত করাটা ও কঠিন অথচ তা-ই ঘটেছে, যা পূর্ব প্রস্তুতির ব্যাপার। অতঃপর ঘটনাটির বিশ্বাস যোগ্যতা আর কি থাকে? তবু তার পক্ষে হাক ডাক দেয়াকে, নির্লজ্জ্য আর ইচ্ছাকৃত আস্ফালন বলা ছাড়া উপায় নেই।

হাটুরে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে পক্ষে বিপক্ষে ক্ষয়ক্ষতি, আর পাল্টা প্রতিশোধাত্মক প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। তাতে বাবুছড়ায় উভয় পক্ষই হতাহত আর লুটতরাজের শিকার হয়েছে, এটা দুঃখজনক। কিন্তু পরে বাঙ্গালীদের ঘর বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা প্রতিহিংসার ফল হতে বাধ্য। এটা অস্বীকার করা যথার্থ নয়। বাঙ্গালী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার হলো সত্য ঘটনা। একাজটি শান্তির অনুকুল নয়। যত দোষ নন্দ ঘোষের মত আমি নিরাপরাধ, এ কেমন বক্তব্য? শান্তি ও সম্প্রীতি চাইলে, বৈরীতা ত্যাগ করতে হবে। ভিক্ষুদের পক্ষেও মৈত্রিভাবনা পরিত্যাগ করা দুঃখজনক।

শান্তি ও সংঘাতে পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা

(১) এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী পার্বত্য জন সংহতি সমিতি কর্তৃক বেশি সমালোচিত হচ্ছে। তাদের কাছে সেনা বাহিনীর ভাবমূর্তি নিছক উৎপীড়কের। দেশ রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন ছাড়া ও তারা যে শান্তি রক্ষা ও সেবা মূলক বিপুল কর্মকান্ডের দ্বারা গঠনমূলক অনেক ভূমিকাই রাখছে, উপকৃত উপজাতীয় সমাজই তার সাক্ষী, তজ্জন্য তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিপরীতে জনসংহতি সমিতি নোটিশ জারী করেছে; অবিলম্বে অপারেশন উত্তরনসহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই দাবী সহ অপর তিনটি দাবীতে তারা আগামীতে তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করবে। তবে সকল বিবেচনায় এটা মান্য যে, এটা এক হটকারী আন্দোলন। যার লক্ষ্য শান্তি স্থাপন নয়, উত্তেজনা সৃষ্টি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপদ্রুত অঞ্চল তো বটেই, এর তিনদিক বিদেশী সীমান্তের দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার আভ্যন্তরীন সংঘাত সংঘর্ষ অপহরণ হত্যা সন্ত্রাস ইত্যাদি হলো চলমান দৈনন্দিন ঘটনা। প্রতিদ্বন্দী জেএসএস ও ইউপি ডিএফ নিত্যদিন পরস্পরের প্রতি মারমুখী। এমন দিন নেই যে দিন তারা পরস্পর কর্তৃক আক্রান্ত হতাহত ও অপহৃত হচ্ছে না। তদুপরি মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ও সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন মহালছড়ি ধ্বংস যজ্ঞ, মারিশ্যার ফাতেমা বেগম হত্যাজনিত উত্তাপ ইত্যাদি। এসব সংঘাত, সংঘর্ষ, দুষ্কর্ম ও উত্তেজনায়, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালনে পুলিশ সম্পূর্ণ অক্ষম, তাই সেনা বাহিনীকেই ভূমিকা গ্রহনে অবতীর্ণ হতে হয়। সেনা ভূমিকা এখানে নিয়ন্ত্রকের নয়, সহায়কের। ধৃত অপরাধী, অস্ত্র, গোলা বারুদ আর উদ্ধারকৃত হতাহতদের পুলিশের হাতে সোপর্দ করে তারা নিজেদের ক্যাম্পে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই ভূমিকা না রাখলে, জনসাধারণ তাদের নেতৃবৃন্দ আর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ও নিরাপদ হতেন না। কেডার বাহিনী বেষ্টিত থাকলেও শীর্ষ উপজাতীয় নেতা ও তার সঙ্গী সাথীদেরও জীবন বিপন্ন হতো। তাই এটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরই কৃতিত্ব যে, সন্তু বাবুরা ঘরে বাইরে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে আছেন। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় শক্তি। তার কাছে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী স্বধর্ম বিধর্ম, জাত-বেজাত ও শত্রু মিত্রের

ভেদাভেদ নেই। সে দেশ ও জাতির সেবায় নিরলস উৎস্বর্গীকৃত। শান্তিকালে সে সবার সেবক ও বন্ধু। একমাত্র দেশ রক্ষার কাজেই সে নির্মম। অতএব এটা ভুল ধারণা যে, সেনা বাহিনী উপজাতীয়দের জন্য উৎপীড়ক ও বাঙ্গালীদের দুষ্পকর্মের সহায়ক। এটা মোটেও স্মরণ করা হয়না যে, সেনা বাহিনী হলো বিবদমান পক্ষ সমূহের মধ্যকার নিরাপত্তা দেওয়াল। সেনা বাহিনীর সেবা ও গঠন মূলক বিপুল কার্যক্রম, প্রভূত উপকার সাধন করছে। তাদের অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তার অভাব বাড়বে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,ক্রীড়া ও সংস্কৃতিগত অনেক শূন্যতা প্রকট হয়ে উঠবে।

প্রতিবাদী নেতৃবৃন্দ একবারও কি ভেবে দেখেছেনঃ সেনা প্রত্যাহারের দাবীর কারণে তাদের প্রতি এই সন্দেহের উদ্ভব হচ্ছে যে, গোটা পার্বত্য অঞ্চলকে জন সংহতি সমিতি নিজ সশস্ত্র নিয়ন্ত্রনাধীন করতে আগ্রহী ? বাংলাদেশী অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করার এটা একটি সূত্র। এটা ও ভেবে দেখতে হবে যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্র গোটা দেশ। বিশেষতঃ এই পার্বত্য বিদ্রোহ প্রবন এলাকা ও সীমান্তকে দৃঢ় সেনা প্রহরাধীন রাখার বিকল্প নেই। এই প্রতিরক্ষা কৌশল অপরিহার্যরূপে পালনীয়। এতে কোন শৈথিল্য প্রদর্শনের অবকাশ নেই। তাই পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবীকে দূরভিসন্ধিমূলক ভাবা দেশ প্রেমেরই অংশ। প্রতিবাদী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের এরূপ স্পর্শকাতর বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। কিছু ক্যাম্প প্রত্যাহারের চুক্তি হয়েছে, এটাই আমোঘ যুক্তি হতে পারে না। চুক্তিতে ভুল ক্রটি হতে পারে এবং বাস্তবে তা হয়েছেও। যেমন প্রতি দফায় সংবিধান অনুসরণের অঙ্গীকার পালন করা হয়নি, সম অধিকার, মৌলিক অধিকার, নির্বাচন ইত্যাদি উপেক্ষিত হয়েছে। সুতরাং শান্তির স্বার্থে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে নেয়াই উচিত। এটাও ভুল যে, আন্দোলনের নামে উপজাতীয়দের পৃথক জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা দেয়া হচ্ছে, যা জাতি ও দেশের অখন্ডতার পরিপন্থী। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এই অখন্ডতার অতন্দ্র প্রহরী। এই ব্যাপারে কোন ছাড় নেই।

আভ্যন্তরিন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন পাশাপাশি বিদেশী সশস্ত্র বিদ্রোহী আর দুস্কৃতিকারীরা ও অরক্ষিত ও দুর্গম সীমান্তের পাহাড় ও বনে, আত্মগোপন করে ঘাটি গেড়ে আছে; এটা কুমতলব এমন সন্দেহ করা অমূলক নয়। ইতিমধ্যে অনেক বিদেশী দুস্কৃতিকারী এবং বিপুল অস্ত্র ও গোলা-বারুদ এই অঞ্চলে ধরা পড়েছে। আভ্যন্তরীন দু'কৃতিকারীদের সহযোগে এরা বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে এরা দুষ্কর্ম চালিয়ে, এখানকার নিরাপদ আশ্রয় ব্যবহার করে, এখানেও হত্যা, অপহরণ, লুটপাট, চাঁদাবাজি ইত্যাদি দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে প্রতিবেশীদের সাথে রাষ্ট্রীয় সৌহার্দ্য বিঘ্নিত হচ্ছে, এবং স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলায় ও ব্যঘাত ঘটছে। এইসশস্ত্র সংগঠিত দেশীবিদেশী দু'কৃতিকারীদের দমাতে পুলিশবাহিনী যথেষ্ট সক্ষম নয়। এই কাজে সেনা বাহিনীর বিকল্প নেই। এই সব কারণে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর অবস্থান অপরিহার্য। এই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা ভুল।

চুক্তিমত জেলা সদর সহ মাত্র ছয়টি স্থানে সেনা অবস্থান অব্যাহত রাখা যথেষ্ট নয়। দূরবর্তী দুর্গম উপদ্রুত স্থানে, তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে সেনা একশন পরিচালনা, তদ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে। সেনা শক্তিকেএরূপ অক্ষমতায় আবদ্ধ করা ক্ষতিকর। রুমার টি এন ও কে দুস্কৃতিকারীরা অপহরণ করে, বাংলাদেশ মিজোরামও আরাকান সীমান্তের ত্রিভুজের একস্থানে আটক করে রেখেছিলো। তাকে উদ্ধার করতে নিকটবর্তী রুমা ক্যাম্পের পরিচালিত সেনা অভিযান সফল হলেও, তা তাৎক্ষনিক সম্ভব হয়নি। বিদেশী নির্মাণ কর্মীরা মহালছড়ি সড়ক থেকে অপহৃত হবার পর কালা পাহাড় এলাকায় আটক থাকেন। নিকটবর্তী আর্মি ক্যাম্প বেতছড়ি থেকে তাৎক্ষনিক উদ্ধার অভিযান চালান হলেও তাতে সুফল পাওয়া যায়নি। সুতরাং আর্মি ক্যাম্প শুধুমাত্র ৬টিতে সীমাবদ্ধ করা মোটেও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। এই ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির জেদ বস্তুতঃ হটকারী। এ ব্যাপারে তাদের নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেনা অবস্থানের উপকারিতা নিয়ে জনসংহতি সমিতির ভাবিত না হওয়া দুঃখজনক। আজ পর্যন্ত সেনা বাহিনী উপজাতীয়দের মাঝে যে বিপুল পরিমাণ সেবা কার্যক্রম চালিয়েছে, মুল্যের হিসাবে তার পরিমাণ বহু কোটি টাকা অংকের সমান। ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, কম্পিউটার ট্রেনিং, শিক্ষার্থীদের বই পুস্তক দান, লাইব্রেরী ও ক্লাব সমুহে পুস্তক সরবরাহ, ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান, কিয়াং ও বিদ্যালয় সমুহে আসবাব পত্র দান, অভাবী ও রোগ গ্রস্তদের চিকিৎসা ও নগদ সাহায্য, ক্ষতিগ্রস্ত কিয়াং, স্কুল ঘর, ক্লাব ও যাত্রী ছাউনী মেরামত ও নির্মাণ, উপদ্রুতদের পুনর্বাসন, গৃহ নির্মাণ সাহায্য, বীজ, চারা ও আর্থিক অনুদানের দ্বারা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন সহায়তা ইত্যাদি বিপুল সেবা অবদানকে একত্রিত করা হলে দেখা যাবে পরিমাণে এসব বিরাট কিছু এবং উপকার রূপেও এসবের অবদান অসামান্য। বিপরীতে দুষ্কর্ম আর নিপীড়নের উদাহরণ একেবারে শূন্য না হলেও, বলা যায়, সে হয়তো বিরল কোন দুর্ঘটনা; যাকে তুচ্ছ জ্ঞানে অবজ্ঞা করাই শ্রেয়।

পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতার অনেকটা সেনা নির্মাণ বিভাগের দ্বারা বিদূরিত। বান্দরবনের রুমা থানচি সড়ক, আলী কদম থানচি সড়ক, আজিজ নগর রুমা সড়ক ইত্যাদি সার্বিকভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে বাঘাইহাট সাজেক সড়কটি ও সেনা বাহিনীর দ্বারা নির্মিত হচ্ছে। রাজস্থলী- ফারুয়া- বিলাইছড়ি- জুরাছড়ি- বড়কল সড়কটিও তদ কর্তৃক নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন আছে। রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক, মানিকছড়ি- মহালছড়ি সড়ক, ঘাগড়া- চন্দ্রঘোনা- রাজস্থলী সড়কের মেরামত ও পূনর্বাসন দায়িত্বটিও তার উপর অর্পিত হয়েছে।

সার্বিক বিচারে সেনা বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল জাতীয় প্রতিষ্ঠান যার উপকারিতা আর অপরিহার্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। দেশ রক্ষা, শান্তি স্থাপন, সেবা ও ত্রাণ কাজে দেশে বিদেশে তাঁর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গঠিত হয়েছে।

কঠোরতা সেনা চরিত্রেরই অংশ। প্রতিরক্ষা মূলক কর্তব্য পালন ক্ষেত্রে তার কোন সদস্যের দ্বারা, অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। সেনা সদস্যর চুমো খাওয়ার জন্য নয়, শত্রু নিধনই তাদের প্রধান কর্তব্য। তবু যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র

তারা আচরনে ভদ্র ও মানবতায় সমৃদ্ধ । সে প্রশিক্ষণ ও তাদের দেয়া হয় । সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলা ভঙ্গ আর দুষ্কর্ম সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এর জন্য চাকুরীচ্যুতি; জেল জরিমানা আর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত প্রাপ্য । যার অবতারনা এই অঞ্চলের ঘটনা প্রসঙ্গে ও হয়েছে । তাই জন সংহতি সমিতির এ ভাবনা অনুচিত যে সেনা সদস্যরা এই অঞ্চলে দুষ্কর্ম আর বাড়াবাড়ির হোতা এবং তাতে তারা শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায় ।

সর্বশেষ ঘটনা মারিশ্যার ফাতেমা হত্যার কথাই ধরা যাক, সেনা বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দুই বিবদমান সম্প্রদায় পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের দাঙ্গালিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রেখেছে । মহালছড়ির মত আরেক লঙ্কাকান্ড বেধে যাওয়া অসম্ভব ছিলোনা । সেনা বাহিনী তার ভয়ঙ্কর ও আপোষহীন অবস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক উত্তাপ উত্তেজনাকে দমিত করেছে । তার নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী বারন শক্তির আবির্ভাব ছাড়া এবার মারিশ্যা সাম্প্রদায়িক হানাহানিও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেতোনা । যদি ও বিবদমান সম্প্রদায় দুটির ফাতেমা হত্যা ঘটনা ও তার মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিচার বিবেচনা ভিন্ন ।

রক্ষকের ভক্ষণ কাহিনী ঃ বন উজাড় বৃত্তান্ত

ক) সাধারণ বিবরণ

বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল পার্বত্য বনভূমি, যার মোট আয়তন ৪৩৮৬.৯৬ বর্গমাইল। হিসাবটি নিম্নরূপ ঃ

ক) সংরক্ষিত বনাঞ্চল	(১) উত্তর বন বিভাগ	৬১৭ বর্গমাইল
	(২) দক্ষিন বন বিভাগ	৩১৫ "
	(৩) শঙ্খ বনাঞ্চল	১২৮.২৫ "
	(৪) মাতামুহুরী বনাঞ্চল	১৬০.৭১ "
	(মোট সংরক্ষিত বন	**১২২০.৯৬ ")**
খ) অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বন		৩১৬৬.০০ "
	সর্বমোট বনাঞ্চল	৪৩৮৬.৯৬ "

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সংরক্ষিত বন আর অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনের সম্পদে তারতম্য বিশেষ ধর্তব্যের যোগ্য ছিলোনা। বর্তমানে দৃশ্যমান ন্যাড়া পাহাড় গুলোর অধিকাংশ তখনো সবুজ বন আচ্ছাদিতই ছিল। কেবল জুম পীড়িত এলাকাগুলোকে সাময়িক ন্যাড়া দেখা যেতো। তবে ঐ ক্ষেত্রগুলো দীর্ঘদিন জুমমুক্ত থাকলে, তা প্রাকৃতিকভাবে পূনরায় সবুজ বনে ঢেকেও যেতো। কিন্তু জুমচাষ কখনো স্থায়ীভাবে বিদায় হয়নি। বারবার গঠিত হয়েছে। এভাবে পূনঃ পূনঃ জুমচাষ মাটিকে বৃক্ষ বীজ হীন ও চারা শূন্য করে দিয়েছে। ফলে বহু চর্চিত জুম ক্ষেত্রে বৃক্ষ নয়, কেবল লতা গুল্ম আর ছনই জন্মেছে। এভাবে ন্যাড়া পাহাড়ের বিস্তার ঘটা শুরু হয় সারা পার্বত্য অঞ্চলে।

রাঙ্গামাটি জেলার নদী উপত্যকা গুলোর অধিকাংশে কর্ণফুলী হ্রদ জনিত নৌ-পথের বিস্তার ঘটেছে, ও তিন পার্বত্য জেলারই আনাচে কানাচে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠেছে সড়কপথ। এই ব্যাপক নৌ ও সড়ক যোগাযোগের সুযোগে, গভীর পাহাড়াঞ্চলেও বৃক্ষ আহরণ ও চালানের বিস্তার ঘটেছে। রোজগার, আর জীবিকার তাড়নায়, স্থানীয় অভাবী লোক আর

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীন লুটেরা শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহল, এবং সর্বোপরি উৎকোচ লোভী কর্তৃপক্ষীয় ভক্ষকরা ও বটে, জোটবদ্ধ কর্তন, লুন্ঠন, পাচার ও ধ্বংস লীলায় লিপ্ত হয় । বৃক্ষ বনহীন হয়ে ন্যাড়া হতে থাকে পাহাড়গুলো । তখন তাদের লোভাতুর দৃষ্টি নিবন্ধ হয় তন্বি সেগুন বাগানগুলোর প্রতি । হাত পড়ে সংরক্ষিত বনে ।

বিশাল রাষ্ট্রীয় বনের বৃক্ষরাজি উজাড় হয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানতঃ দায়ী জুম চাষ, তৎপর জোত পারমিটের বলে সরকারী বন বাগানে চালিত অবাধ বৃক্ষ লুট । নামে বন হলেও, বিশাল রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের সম্পদ সংরক্ষনের কোন ব্যবস্থা ছিল না । এটিকে কেবল জুমমুক্ত ও আহরন নিয়ন্ত্রিত রাখা গেলেই, প্রাকৃতিক ভাবে ঘন বনে আচ্ছাদিত হয়ে যেতো, এবং জুম নিয়ন্ত্রন বিভাগের খবরদারি, পরিচর্যা ও সম্প্রসারিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষায়িত বৃক্ষ বন রূপে ও গড়া সম্ভব হতো । হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ধারা নং - ৪১ ও ৪১/ক এবং বন আইন এ্যাক্ট নং ৭ - ধারা ২/১৮৬৫ বলে জুম নিয়ন্ত্রন বিধি সম্মত হলেও, তা কদাপিও কার্যকর হয়নি । দীর্ঘ আচরিত ও খাজনা পরিশোধিত পেশা হিসাবে, জুম চাষ বেআইনী ও নয় । জুম ক্ষেত্রটি খাস ভূমি হলেও তা দীর্ঘদিন যাবৎ উপজাতীয় জুমিয়া নিয়ন্ত্রিত । তাতে তাদের পেশা অধিকার ও স্বীকৃত । এ ব্যবস্থাটি বৃক্ষ সম্পদ রক্ষার অন্ত রায় । যদিও এর বিপরীতে বিবেচ্য ছিল জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিকটি ।

দরিদ্র পাড়াবাসী ও উপজাতীয় জুমিয়া লোকজনের দারিদ্র্য, রোজি রোজগার, ও জীবিকার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচ্য, যা ভিন্নভাবে সমাধান যোগ্য । উচ্চভূমি বন্দোবস্তি, বাগান সৃজন, হাস মুরগী ও পশু পালন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করা আবশ্যক ছিলো । তাতে জুমচাষ ও বৃক্ষ নিধন থেকে বিরত করা যেতো । সংরক্ষিত বনে বাগান সৃজনের মত প্রতিটি জুমক্ষেত্রে বীজ বপন ও গাছের চারা রোপন কর্মসুচী গ্রহন করে পাড়াবাসী ও জুমিয়াদের চারা ও বীজ সরবরাহ এবং বনায়নের জন্য কিছুটা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেও জুমের বৃক্ষ নিধনের ক্ষতি পূরন করা সম্ভব ছিলো । কিন্তু এরূপ গঠন মূলক পরিকল্পনা কখনো গৃহীত হয়নি ।

সংরক্ষিত বনের বাহিরে, বৃক্ষ সম্পদে টান পড়েছে । কয়েক দশক আগের সেগুন বাগান গুলো এখন পরিপক্ক ও দৃষ্টি নন্দন রূপে দৃশ্যমান । এখন এগুলো আহরন ও পাচার করার প্রতি দুর্নীতিবাজ ও সম্পদ লোভী লোটেরা শ্রেণী আকৃষ্ট । তারা জোতের নামে ফ্রি পারমিট সংগ্রহ করে বন কর্মী ও অন্যান্যদের উৎকোচের মাধ্যমে বশে এনে, বাগান উজাড় করে সেগুন গামার ইত্যাদি জাতের গাছ কেটে নামিয়ে আনছে । বনের বাহিরে এলেই এগুলো ব্যক্তিগত জোতের গাছ রূপে অভিহিত হয় । অথচ পাড়া পরিবেশে সেগুন গামারের ব্যাপক কোন বাগান গড়ে উঠেনি । থাকলেও কচিত এবং দু চারটির বিচ্ছিন্ন উপস্থিতি মাত্র লক্ষ্যনীয় । হিসাব করলে দেকা যাবে রোজ শত শত ট্রাক ভর্তি সেগুন গামার সমতলের দিকে পাড়ি দিচ্ছে । এগুলোর পক্ষে প্রধানতঃ জোত পারমিটের ট্রেনজিট পাস থাকে । ঘাটে ঘাটে বনকর্মী, প্রশাসন,পুলিশ, বিডিআর ও আর্মি কর্তৃক চেকিং ও হয় । কোন অবৈধতা

পরিলক্ষিত হয়না। তবে লেন দেনের গরমিল হলেই ফেকড়া বাঁধে। এরূপ কিছু কাঠ আটক হয়, এবং তা মাঝে মধ্যে নিলামেও ওঠে, যা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সততা ও স্বচ্ছতার প্রমান হয়ে দাঁড়ায়। তবু ন্যাড়া পাহাড়গুলো বলে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ও ন্যাড়া হতে বেশী দিন বাকি নেই। এখন বাহিরে আচ্ছাদন আছে, ভিতরে ফাঁকা।

জোত পারমিটের বলে সংরক্ষিত বন লোপাটের সর্বাধিক বড় ক্ষতি হলো, সরকারের বন বাগান সৃজনের পিছনে ব্যয়িত ও বিনিয়োগকৃত কোটি কোটি টাকার লাভে আসলে গচ্ছা যাওয়া, এবং স্থানীয় প্রায় সব বড় কর্মকর্তাদের টাকার বিনিময়ে দূর্নীতির সাথে আপোষ করা, ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। আমলা মহলের এই চরিত্র হানি দুর্নীতি প্রসারে সহযোগিতা যোগাচ্ছে। নীতি আদর্শ ও শাসনের দৃঢ়তা তাতে লোপ পাচ্ছে।

কে কাঠ পাচারের লাভের অংশ নেন না, তা নির্ণয় করা কঠিন। কিছু সৎ ও নির্লোভ কর্মকর্তা অবশ্যই আছেন। কিন্তু তারা চাকুরী স্বার্থে অসহায় নীরব। চোরদের সাথে বাগান থেকে গাছ কেটে নামানোর চুক্তি হয়। নদীতে নামানো, বা অন্যত্র সরানোর আগেই, ফুট প্রতি নির্দিষ্ট হারে লেনদেন হয়ে যায়। তৎপর বহু নদী ঘাট, সড়ক ঘাট, নৌকা, সাম্পান ও ট্রাকের যাত্রা প্রতি, নির্দিষ্ট হারে উৎকোচ দিতে দিতে অগ্রসর হতে হয়। বড় সাহেবদের যাদের হাতে শাসন, প্রশাসন, আইন কানুন, ও বাহিনী শক্তি নিহিত, তাদের ট্রাক প্রতি প্রদেয় এক থেকে তিন হাজার টাকা। এই দুর্নীতি চক্রের পরিচালক, কাঠ ব্যবসায়ী সংগঠন। তারাই উৎকোচের সব টাকা সংগ্রহ করে, ও জনে জনে পৌঁছে দেয়। এই পাচার ব্যবস্থার বৈধতার ছত্র হলো জোত পারমিট। আসলে ব্যক্তিগত জোত ভূমিতে গাছ থাকার কোন প্রয়োজন হয়না, টাকাই সব। তাতে খালি ময়দান বাগান হয়ে যায়।

বন কর্মকর্তারা একবার কাঠুরিয়া থেকে টাকা নেন, ঘাটে ঘাটে চেক করতে টাকা নেন, পারমিট ও ট্রেনজিট দিতে টাকা নেন। এভাবে কাঠ মূল্য ও উৎকোচের প্রধান অংশ তাদের পেটেই যায়। পারমিট প্রদান ও কাঠ পাচারে তাদের ভূমিকাই প্রধান। এ কাজগুলোকে জায়েজ ও বাধাহীন করতে অন্যান্য অ-বনবিভাগীয় কর্তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, তাই তাদের বশ করা হয়, যাদের পাওনা ফাও। আসল নাটের গুরু হলেন বন কর্মকর্তারাই। এভাবে এক ফুট সেগুন কাঠ ঢাকায় পৌঁছতে হাজার টাকা খরচ হয়। এই কোটি কোটি টাকার সম্পদ থেকে সরকারের এক পয়সাও আয় হয় না। অথচ সরকারী সম্পদ হিসাবে প্রতি ঘনফুট সেগুন কাঠের উপর সরকারের ব্যয় শত শত টাকা।

বন লোপাট সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে মানচিত্র হাতে হেলিকপ্টারে করে একবার বনের আকাশটি ঘুরে এলেই বুঝা যাবে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলটি প্রায় বৃক্ষশুন্য ফাঁকা।

এখন আর বন মহাল নিলাম হতে দেখা যায় না। কাঠের চালি নদী ও হ্রদ পথে ভাসিয়ে নেয়াটা ও বিরল। বন বৃক্ষশূন্য বলেই হয়তো এমন অবস্থা। বলা হয়, কাঠ চোররা সংগঠিত শক্তিশালী ও সশস্ত্র। বনরক্ষীরা তাদের বিপক্ষে অসহায়। এটা একটি ভূয়া অজুহাত।

চুরি ও পাচারের অধিকাংশই তো হয় প্রকাশ্যে পারমিটের বলে, যা ঘটে থাকে কর্মকর্তাদের হাতে।

পত্রিকায় প্রকাশিত অংকের চেয়ে পাচারকৃত কাঠ ও অর্থ ভাগাভাগির পরিমাণ আরো বিরাট, আরো ভয়াভহ। বিশ্বাসযোগ্য ও প্রচারযোগ্য হবেনা বলে, বিবরণটি কেটে ছেটে ছোট করা হয়ে থাকে বলেই আমার বিশ্বাস।

খ) প্রধান সংরক্ষিত বন কাচালং

রাঙ্গামাটি উত্তর বন বিভাগ সর্ব বৃহৎ বনাঞ্চল কাচালং নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৬১৭ বর্গমাইল। ১৯৬০ সালের আগে এটি মাইনীমুখ থেকে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত আরো বৃহৎ ছিলো। কিন্তু কর্ণফুলী হ্রদের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মাইনীমুখথেকে মারিশ্যা পর্যন্ত অঞ্চল বনমুক্ত করে বসতি স্থাপন করা হয়। এটি কেবল আয়তনেই বড় ছিলো না বনজ সম্পদেও ছিলো সর্বাধিক সমৃদ্ধ। সবুজ ঘন বনে সূর্য্যের আলো পর্যন্ত দেখা ছিলো কঠিন। দূর্গমতার কারণে নদীর তীরবর্তী গাছ গাছড়া লতা পাতা ছন বাঁশই মাত্র আহরিত হতো। পরিবহন ও আহরনের দুরূহতায়, গভীর দুরের বন থাকতো অচ্ছুত। আসাম থেকে ফেরৎ সিলেটী হাতি মালিক ও কাঠব্যবসায়ী লোকেরা, ১৯৪৭ সালের পর এতদাঞ্চলে কর্মসংস্থানে ভীড়জমান এবং সরকারের গঠিত বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও যান্ত্রিক কাঠ আহরনে নিযুক্ত হয়। কর্ণফুলী কাগজ কল ও শিলছড়ির প্লাই উড ফেক্টরীতে পণ্য প্রস্তুতে নরম কাঠ ও বাঁশের ব্যাপক প্রয়োজন হয়। দেশ জুড়ে ও উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজে কাঠ বাঁশের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে কাঠ বাঁশের আহরণের কৌশল ও সরবরাহের বৃদ্ধি ঘটে। দুর্গম ও দুরবর্তী অঞ্চল থেকে ও হাতি আর ট্রাক্টারের সাহায্যে কাঠ আহরণ শুরু হয়। পরে ১৯৬০ সালে কর্ণফুলী বাঁধের দ্বারা নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে ২৫৬ বর্গমাইল নদী উপত্যকা জল মগ্ন হলে,বনের আনাচে কানাচে অবস্থিত ছড়া উপনদী ও উপত্যকা নাব্য হয়ে কাঠ আহরণ ও চালান সহজতর হয়ে ওঠে,ও অনেক ক্ষেত্রে বনের দুর্গমতার অবসান ঘটে। নদী পথে চালি করে কাঠ বাঁশের চালান হয় সহজতর। বন বিভাগ এই সুযোগে কাঠ মহাল নিলামের দ্বারা বিক্রয় বৃদ্ধি ও নতুন বনায়নে ও মনোযোগী হোন।

উত্তর বন বিভাগের কাচালং বনাঞ্চলটি, নদী উজানের উত্তর পূর্বেল দূর্গম সীমান্ত পাহাড়ে অবস্থিত হওয়ায়,তাতে চুরি ও পাচারের পক্ষে পরিবেশ অনুকূল ছিলোনা। ফলে এখানে বন ধ্বংসের প্রক্রিয়া, বসতি বিস্তার, জুম চাষ ও বেআইনী আহরন কাজ নদী ও সড়ক পথে এই তিন ধারায় ধীরে পরিচালিত হয়েছে। পূর্ব উত্তর সীমান্তের মিজোরাম সীমান্তবর্তী ছয়টি মৌজার সমষ্টি সাজেকের এক ফালি বসতি ছাড়া মাইনী,কাচালং, গঙ্গারাম, মাচালং, ও শিজক উপত্যকার প্রায় গোটাটাই ছিলো সংরক্ষিত বন। মাইনী নদীর পূর্ব তীরের কিছু বসতি এলাকা, এবং মধ্যকাচালং এর পূনর্বাসন এলাকা বাদে, এই বিশাল এলাকাটি প্রাকৃতিক ভাবেই সুরক্ষিত। এখানে ব্যাপক চুরি ও পাচারের সুযোগ কম। তবু এই সমৃদ্ধ বনাঞ্চলটি অরক্ষিত নেই। উত্তর সীমান্ত আর সাজেকের কাছাকাছি অবস্থিত বিরাট এলাকা এখন বাস্তবে বনহীন। এখানে অনুপ্রবেশকারী ত্রিপুরা, মিজো, পাংখো, আর

চাকমা সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক, জুমচাষের মাধ্যমে বিস্তৃত অঞ্চল বনমুক্ত করে ক্রমান্বয়ে বসতি গড়ে তুলেছে ও তুলছে। এই বেআইনী বসতি বিস্তার প্রক্রিয়া, বাধা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে না। মাইনী নদীর পূর্বপারবাসী উপজাতীয় লোকেরা ও পূর্বের এই বনাভ্যন্তরের দিকে,তাদের চাষাবাদ ও বাড়ি ঘরের বিস্তার ঘটাচ্ছে। তাতে উৎসাহিত পশ্চিমের আবাদী ও বসতি অঞ্চল এখন গঙ্গারাম নদী তীর ছুই ছুই করছে। ফলে চতুর্দিক থেকে কাচালং বনাঞ্চল সংকুচিত হচ্ছে।

এই অঞ্চলটি ছিলো বন্য পশু পাখী ও গাছ পালার জন্য প্রাকৃতিক ভাবে গঠিত অভয়ারন্য। এখন মানুষের আনাগোনা ও বসতি বাড়ায়, তাতে বন্য পরিবেশ ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বিভিন্ন বিচিত্র গাছ গাছড়া বন আর পশু পাখী ভীষন ভাবে কমে এসেছে, এবং তাদের কিছু কিছু বিলুপ্তির পথেও বটে। বাঘ, ভাল্লুক, শুকর, হরিণ ইত্যাদি কিছু প্রাণী প্রায় নেই বল্লেই চলে। একমাত্র দৃশ্যমান বৃহৎ বপুর হাতির সংখ্যা ও সীমিত হয়ে এসেছে। তাদের খাদ্য আশ্রয় ও বিচরন ক্ষেত্র সংকুচিত, তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এরা মাঝে মধ্যে বসতি অঞ্চলে হানা দিতে বাধ্যহয়। পাখী কুলের অবস্থাও বিপন্ন। এখন আগের মত তাদের কল কাকলী আর আনাগোনা নেই। পশু শুমারী ও পাখী শুমারীর ব্যবস্থা থাকলে বুঝা যেতো তাদের কত প্রজাতি চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। সরিসৃপেরাও সংখ্যা ও তৎপরতায় আগের মত বীরদর্প প্রদর্শন করেনা। তাদের সংখ্যা এখন অত্যন্ত সীমিত।

জীবন জীবিকা ও পরিবেশ রক্ষায় বন ও বন্য প্রাণী রক্ষা জরুরী। এর উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। সংরক্ষিত বনে অনুপ্রবেশ কারীদের অবশ্যই তাড়াতে হবে। নইলে বন রক্ষা পাবে না। বন রক্ষী ও কর্মকর্তা মহল নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবিত। তবে তারা কামাই রোজগারের অনাচারের সাথেও জড়িত। এই প্রতিটি বিষয়ের সুরাহা জরুরী। মাইনী বন চেক পোষ্ট, আর সুবলং বন চেক পোষ্ট দিয়েই উত্তরের প্রায় সব বনজ দ্রব্যের চালান ভাটির দিকে যায়। এ দুটি হলো বড় রোজগার কেন্দ্র। হিসাব করলে বিস্মিত হতে হবে যে, দক্ষিন বন বিভাগের মত উত্তর বন বিভাগে সাগর চুরি না হলেও, পরিমাণে তা থেকে কম নয়।

অভাবী সাধারণ লোক, আর দূর্নীতি-বাজ কাঠ ব্যবসায়ীরা অবশ্যই দুষ্ট চক্র। তবে তাদের পৃষ্ঠ পোষক ও মদদ দাতা হলেন বন রক্ষী ও কর্মকর্তা মহল। বনের বাহিরে পথে পথে স্থাপিত অসংখ্য বন চেক পোষ্টের প্রধান কাজ হলো চোরদের কাছ থেকে বখরা আদায়, এবং বৈধ পারমিটের বনজ দ্রব্য আর আসবাব পত্রের চালানকে ও ঠেকিয়ে উৎকোচ আদায়। এই উৎকোচের হার বাধা। বিনা উৎকোচে বৈধ পারমিটের কাঠ বাঁশ লতা পাতা আর ফার্নিচারের উৎকোচহীন এ ঘাটগুলো পার হওয়া অসম্ভব। এমন নজির ও নেই। ঐ চেক পোষ্টগুলোর দ্বারা, অবৈধ চালান আটক বা শুল্ক আদায় অতি বিরল ঘটনা। এমনটি হলে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার হতো।

শুল্ক মুক্ত জোত পারমিট সরকারী বনের চোরাই কাঠ পাচারের প্রধান মাধ্যম এবং জোতের মালিকরা নয়, কাঠ ব্যবসায়ী আর বন বিভাগীয় লোকেরাই এই পারমিটের অপব্যবহারের হোতা। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে জোতের কাঠ নিশ্চিত করা দরকার। নইলে শুল্ক আদায় বাধ্যতামূলক করা জরুরী। তাতে সরকারী ফান্ডে কিছু হলেও জমা হবে।

সেগুন কাঠ বাগানে নিলামকরা আবশ্যক। তাতে সরকারের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত, এবং চুরি ও পাচার অনেকাংশে বন্ধ হবে বলে আশা করা যায়। কেটে নিয়ে শহরের ডিপোতে বিক্রি করা এক জটিল প্রক্রিয়া। বন অক্ষত রাখার এটা উপায় বলে প্রমাণিত নয়। সেগুন বাগান নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা হলে কাঠ ব্যবসায়ীরাও বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ পাবে। তাতে কিছুটা হলেও চুরি ও পাচার বন্ধ হবে।

গ) রাইংখ্যং সংরক্ষিত বন

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম সমৃদ্ধ বন হলো রাইংখ্যং রিজার্ভ ফরেষ্ট। ঠেকা, সুবলং ও রাইংখ্যং নদী বিধৌত উপত্যকা ও পাহাড় নিয়ে গঠিত পূর্ব সীমান্তবর্তী এই বনাঞ্চলই দক্ষিন বন বিভাগ। এর আয়তন ৩১৫ বর্গমাইল। ১৯৬০ সাল পরবর্তী সৃজিত সেগুন বাগান হলো এর প্রধান সম্পদ। নদী তীরবর্তী সমতল ও সহজ ঢালু পাহাড়গুলোকে সেগুন বাগানভূক্ত করা হয়। দুর্গম দূরবর্তী অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক বনাধীন থেকে যায়।

আগে এ বাগানগুলো কঠিন পাহারাধীন ছিলো। নৌপথ ও সড়ক পথ এত সহজ ও ব্যাপক ছিলো না বলে ১৯৬০ এর পূর্ববর্তী কালে কেবল বর্ষা মৌসুমে কাঠ, বাঁশ, লতা, ছন, ইত্যাদি বনজ দ্রব্য সীমিত আকারে আহরিত হতো। তাই প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ও বন রক্ষার্থে সহায়ক ছিলো। সে আমলে ১৯৭০ সালে রাইংখ্যং মাথার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ব্যাপক এলাকায় জুমিয়ারা বন কেটে জুমচাষ ও বসতি বিস্তারে লিপ্ত হয়। ওদের দমাতে ও বন রক্ষায় ১৯৭১ সারে শুরুতে ঐ অঞ্চলে একদল সীমান্তরক্ষী ইপিআর পাঠান হয়। কিন্তু অচিরেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। তৎপর রাইংখ্যং বন ধ্বংসের দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা এবার ২০০৩ সালে ঘটা শুরু হয়েছে, যার সাথে জুম স্বার্থ নয়, বাণিজ্য স্বার্থ লোভ ও দূর্নীতিটাই প্রধানতঃ জড়িত। এই ধ্বংস যজ্ঞটা এতো ব্যাপক যে, জুমিয়ারা বাদে হাজারো বহিরাঞ্চল বাসী যাদের মাঝে ভারতীয় আর বর্মী শ্রমিকরাও আছে, এবং বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরাও ইন্ধনদাতা, তাতে বন রক্ষা পাওয়াটাই কঠিন।

সরকারের বহু কোটি টাকা বিনিয়োগে সৃজিত এই সমৃদ্ধ সেগুন বাগানটি ব্যাপক লুটপাটের শিকার হয়েছে এবং আমাদের চোখের সামনে দিয়েই তা পাচার হচ্ছে, যা অস্বীকার করার মত ব্যাপার নয়। সেগুন কাঠ নিয়ে নৌকা সাম্পানের সারি কাপ্তাই ও রাঙ্গামাটি আসছে। তৎপর ট্রাক ভর্তি হয়ে তা সমতলের দিকে যাচ্ছে, এটা তো অপ্রিয় সত্য। এ কাঠের উৎস কি জোতের ব্যক্তিগত জায়গা জমি ও তাতে সৃজিত বাগান? এমন ব্যাপক জায়গা জমির মালিকানা ও বৃক্ষ বাগান পাবলিকের কাছে থাকা সন্দেহ জনক। এটি

পুরাতন প্রশ্ন। পত্র পত্রিকায় সব সময়ই জোত পারমিটের মাধ্যমে সরকারী বন বাগান লুট হওয়ার খবর এবং তার সাথে বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা থাকার অভিযোগ প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু এবারের এ অভিযোগটি ছিটে ফোটা চুরি ও পাচারের নয়। এটা পুকুর চুরি নয়, একেবারে সাগর চুরি। হাজার হাজার দেশী বিদেশী লোক লাগিয়ে হুলস্থুল বাঁধিয়ে, রীতিমত হাট বসিয়ে, বহু বর্গমাইল বিস্তৃত বনাঞ্চলের গোটাটাই কেটে ধরাশায়ী ও পাচার করা হচ্ছে, এবং সে অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ জোত পারমিট ও ইস্যু হচ্ছে, এটাতো অরাজকতা। এই ঢাক পিটানো অভিযোগের কোনসদুত্তর বন বিভাগ বা প্রশাসন থেকে দেয়া হচ্ছে না। এর সত্যাসত্য যাচাই দিয়েও কোন উচ্চ বাচ্য নেই। বরং নীরবে ট্রানজিট পাস দিয়ে এই বিপুল চুরি ও পাচারকে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে সহায়তা করা হচ্ছে। দেশে শাসন ও আইন শৃঙ্খলা থাকতে এমনটি হবার নয়। পুলিশ, বিডিআর, সেনা বাহিনী তো পাচার এলাকায় ঘাটি গেড়েই আছে। অক্ষম বন বিভাগ তাদের ডেকে এনেও এই ধ্বংস যজ্ঞ বন্ধের ব্যবস্থা করছে না। ব্যাপার কী ?

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাইংখ্যং এলাকায় বাহিরের লোকজনের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। উপজেলা সদর বিলাইছড়ি পর্যন্ত যাওয়াটাও কষ্টকর। তৎপর উপরের বনাভ্যন্তরের দিকে যাতায়াত রীতিমত বিপজ্জনক। পথে পথে ঘাটে ঘাটে বহু চেক পোষ্ট। জন সংহতি সমিতি, কাঠ ব্যবসায়ী সমিতি, বনরক্ষী ইত্যাদি সংগঠন এই চেক পোষ্ট পরিচালনা করে থাকে। যাতায়াত নিবারনে শারীরিক জবরদস্তি ও দুর্ব্যবহার চালান হয়। কাঠুরে, কাঠব্যবসায়ী ও স্থানীয় পাড়াবাসী এই নিশ্চয়তা ছাড়া যাতায়াত নিষিদ্ধ।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের লোকই, রাইংখ্যং অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। এতদিন তাদের দ্বারাই কাঠ বাঁশের সীমিত আহরণ পরিচালিত হতো। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ও ছিলো এটি। কিন্তু গোটা বন লোপাটের কর্মকান্ড শুরু হওয়ার পর, তাদের জনবল এ কাজের পক্ষে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন হাজার হাজার কাঠুরের প্রয়োজন, যে চাহিদা পূরনে কাছের ও দূরের, দেশী ও বিদেশী, তথা ভারতীয় ও বর্মীরাও নিযুক্ত। রাইংখ্যং উপত্যকা জুড়ে এখন লোকে লোকারন্য গিজ গিজ অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় তঞ্চঙ্গ্যা যুবতী ও তরুনীরা ব্যাপক হারে বহিরাগতদের যৌন সঙ্গী ও অপহরনের শিকার হচ্ছে। অনেকে প্রতারিত হয়ে ঘরেও ফিরছে। এই অনাচার স্থানীয়ভাবে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করছে। তাতে হাট বাজার শহর বন্দর হয়ে এই প্রচার প্রচারনা ব্যাপকতর হয়েছে যে, বহিরাঞ্চল ভারত ও বার্মাবাসী বিপুল লোকজনের সহায়তায়, রাইংখ্যং বনের সরকারী সেগুন বাগান সমূলে ও সর্বাংশে ধরাশায়ী ও পাচার হয়ে যাচ্ছে। চোখে ও দেখা যাচ্ছে পীপিলিকার সারির মত নৌকা সাম্পান ও ট্রাকের বহর প্রধানতঃ সেগুন কাঠ বোঝাই হয়ে প্রথমে নদী পথে তৎপর সড়ক পথে সমতলের দিকে ছুটছে। এর বিরাম ও বিরতি নেই। এতো বিরাট বিপুল সেগুন চালান ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। বন বিভাগীয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এমনটি ঘটা অসম্ভব। এরাই আসল বন খাদক বলে সন্দেহ করা যায়।

ব্যক্তিগত জোত জমিতে সৃজিত বৃক্ষ বাগানের সত্যাসত্য যাচাই, পারমিট ইস্যু, কাঠের গোড়া কান্ড চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ গ্রহণ, এবং সর্বোপরি সরকারী বন বাগানের কাঠ চুরি ও পাচার বন্ধ নিশ্চিত করণ, বন বিভাগীয় দায়িত্ব। মনে হয় কার্যক্ষেত্রে এ সবের কোন বালাই নেই। সরকারী বনের কাঠই জোত পারমিটের কাঠ। বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জোত পারমিট ও বন বাগান বিক্রির বাণিজ্যই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পথে ঘাটে বাগানে যেখানে যত কাঠ আছে, তা অবিলম্বে জব্দ করা উচিত এবং সরেজমিনে তদন্ত হওয়া আবশ্যক যে, কোথায় কত জোত বাগান আছে, এবং সরকারী বন বাগানগুলোর হাল অবস্থা কী।

ঘ) তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও বন লুটের প্রক্রিয়া অব্যাহত

লক্ষণে মনে হচ্ছে বনাঞ্চল সর্বাংশে বিরান না হওয়া পর্যন্ত লুট পাট থামবে না। চেচামেচি প্রতিবাদ, প্রতিবেদন আপত্তি, মৃদু ধর পাকড়, জব্দ, তদন্ত ব্যবস্থা, সবই ব্যর্থ। কাঠ পাচার ও চুরি সমানে চলছে। আগে রাংগামাটি, কাপ্তাই, বান্দরবন, লামা আলীকদম, ও খাগড়াছড়ি থেকে দৈনিক যত ট্রাক সেগুন গামার ইত্যাদি কাঠ পাচার হতো এখনো তাই হয়, মোটেও কমে নি। জোত পারমিট ইস্যু হ্রাস, চুরি নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি বৃদ্ধি, বনে ও নৌ পথে অভিযান ও কাঠ আটক ইত্যাদিতেও চুরি ও পাচার হ্রাস পাচ্ছে না। বেআইনীভাবে আহরিত হাজার হাজার ঘনফুট কাঠ আটকের সংবাদ পত্র পত্রিকায় প্রচারিত হওয়া, বন-বিভাগ ও তার সহায়তাকারী বাহিনীগুলোর পক্ষে উল্লাস জনক হলেও তা পরিমানে মোট পাচার ও চুরির এক শতাংশ কিনা, এ সন্দেহ অমূলকনয়। এই আটক অভিযান প্রশংসনীয় হলেও যথেষ্ট ও সন্তোষ জনক নয়। বনের গাছকে তার গোড়ায় রক্ষা করতে হবে। এবং চোরদের উৎখাত করতে হবে মূল বন থেকে। ওখানে বন রক্ষীদের মাঝে ওরা ঘাপটি মেরে থেকে তৎপরতা চালাচ্ছে। জোত পারমিটের গাছের অবস্থান ও গোড়া নির্ণয়কারী বন কর্মকর্তাদেরকে তার যথার্থতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই জোত পারমিটের অবৈধ ব্যবহার হ্রাস পাবে ও কাঠের অভাবে তার দাম ও চাহিদা কমে আসবে। এভাবে পাচার ও চুরির মূল নিয়ন্ত্রণ করা না হলে বন রক্ষা পাবে না।

বন বিভাগে সততা ও দায়িত্ব পালনে গুরুতর অভাব আছে। অবৈধ কামাই রোজগারকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। ভাল ষ্টেশনে পোষ্টিং নিতে লাখ লাখ টাকা উৎকোচ লাগে। এটাই অবৈধ কামাই রোজগারের ভিত্তি। যারা সৎ, তাদের গাড়ী বাড়ি, পদোন্নতি, এ সব কিছুই হয় না। তাদের সৎ থাকাও অত্যন্ত কঠিন। একদিকে নিত্যদিন বোসদের চাহিদার ঠেলা, অন্যদিকে সুযোগের বিনিময়ে উড়ো টাকার সুড়সুড়ি। সহকারী, সহযোগী অধস্তন আর উপর ওয়ালা, সবাই এক গড্ডালিকা প্রবাহে আবদ্ধ। ব্যতিক্রম করার উপায় নেই। (উল্লেখ্য যে অন্যান্য সরকারী বিভাগেও কম বেশী এমনটি প্রচলিত)।

আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পোষ্টিংকে শাস্তি স্বরূপ জ্ঞান করা হতো। এখন তা হয়েছে

আশীর্বাদ। শোনা যায় কেবল কাঠ পাচার বাবদই বড় কর্তাদের একেক জনের আয় বছরে প্রায় কোটি টাকা। এই আয় বারোয়ারী। তা থেকে কেউ বাদ যান না। যেন সমঝোতার ভাগ বাটোয়ারা। কাঠ ব্যবসায়ীরা এই আয়ের প্রধান নিয়ামক। এদের সংগঠনটিও স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত মালদার। একটি ব্যাংক এই মালে গণিমতের গন্ধ পেয়ে, তাদের আলীশান বিল্ডিং-এর দু'তলায় একটি শাখা খুলে বসেছে। উদ্দেশ্যঃ আমানত বৃদ্ধি। অন্য গ্রাহক না হলেও চলবে।

এই ধনকুবেরদের নেকনজর ও আশীর্বাদ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বন বিভাগ আর তাবৎ বড় কর্তাদের নিয়েই তাদের কাজ কারবার। যাতে কোথাও আটকাতে না হয়, এবং ফাঁকে পড়ে গেলেও মুক্ত হওয়া যায়। পত্রিকার কলাম লেখক ও রিপোর্টারেরা মাঝে মধ্যে তাদের খানেক ডিসটার্ব করেন। তবে বড় সাহেবদের আশীর্বাদে তাতেও ডোন্ট কেয়ার। এটা চিমটি কাটার বেশী কিছু নয়। অবশ্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে কিছুটা হিসাবে রাখতে হয়। মাঝে মধ্যে তাদের কিছু চাঁদা, আর সভা সম্মেলনে সহযোগিতা দিলেই চলে। তবে সেদিন হঠাৎ ব্যতিক্রমী কিছু ঘটতে যাচ্ছিল। ভাংচুর শুরুর মূহুর্তে হাত জুড়ে তাদের কাছে সময় চাওয়া হলো। বনমন্ত্রী ও ধূসরদের সামলাতে তারা ফুতুর।

প্রশ্নঃ বন সংক্রান্ত অনাচার কি বনমন্ত্রীদের গোচরিভূত হয়না? বড় বড় জাতীয় পত্রিকা, স্থানীয় পত্রিকা ইত্যাদিতে হরদম বন সংক্রান্ত অনাচার আলোচিত হচ্ছে। সরকারের তথ্য বিভাগ তা সংশ্লিষ্টজনদের নিয়মিত অবগত ও খবরের কাটিং সরবরাহ করছে। বিভাগীয় পর্যায় থেকে মন্ত্রীসভা পর্যন্ত তা ঘুরছে। কিন্তু প্রতিকার হতে দেখা যায় না। এই অবজ্ঞা ও নির্লিপ্ততা দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবন এতই কি ঢিলাঢালা আর উচছন্ন? এবার সঠিক তদন্ত আর প্রতিকার যদি হয়, এই প্রতীক্ষা।

নীতিগত ও আইনগত ভাবে কিছুই জবাবদেহিতার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এর ভিতরও জবাবদেহিতার অভাব বিদ্যমান। নীতি ও আদর্শই দেশ চালাবার ভিত্তি। তবু এটা ক্ষণে ক্ষণে অবহেলিত। বিচার ব্যবস্থা সকল অনিয়ম ও অপরাধের নিয়ন্তা। তবু এটা যেন অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

দেশে সৎ ও শক্তিশালী জাতীয় নেতৃত্বের অভাব প্রকট। তাই সর্বত্র নীতি আদর্শ ও আইন লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া প্রবল। যে শাসন করবে, সে-ই দূর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এখন কার উপর ভরসা করা যায়? গোটা পরিবেশটাই দূষিত। মানব পরিবেশে মানুষেরা অশান্ত। বন্য পরিবেশে পশু পাখীদেরও স্বস্থি নেই। আমরা যাই কোথা? সঠিক তদন্ত আর প্রতিকার হোক, এটাই কাম্য।

বাংলাদেশের অখন্ডতার উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরূপ প্রভাব ও তার প্রতিবিধান

বাঙ্গালী জাতি সত্তার ইচ্ছা ও প্রাধান্যই, বাংলাদেশকে পৃথক এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে দেশ ভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হলেও বাস্তবে এই সমন্বিত জাতি সত্তার ৯৯% হলো বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী সমন্বিত। এই বাস্তবতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক ভাবে উপজাতীয় প্রাধান্য মন্ডিত জন্ম জাতিয়তাবাদও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা। এতদাঞ্চলে বাংলাদেশী চরিত্র আরোপই এর সমাধান।

বিশেষ জাতিসত্তার আধিপত্য মন্ডিত এলাকা সমূহে স্বায়ত্ত শাসন স্বাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার দাবী উত্থিত হয়, তার পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের অবতারনা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিনতিতে ঐ অঞ্চলে অশান্তি, দুর্ভোগ ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাতে লোকেরা বিপুল সংখ্যায় হতাহত হয় এবং আত্ম রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন কোন মুরব্বী রাষ্ট্র এমন কি জাতিসংঘ পর্যন্ত তাতে হস্তক্ষেপ করে। এর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হলো বসনিয়া, ক্রোশিয়া ও সার্ভিয়ার পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া,গণভোটে প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ট রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব তিমুরেরস্বাধীনতালাভ এবং বিদ্রোহী দক্ষিন সুদানেরও অনুরূপ সম্ভাবনার দিকে অগ্রযাত্রা। অনুরূপ জাতিগত উত্তেজনার প্রধান ক্ষেত্র হলো ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর। বাংলাদেশের উপজাতীয় অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামও অনুরূপ একটি অশান্তঅঞ্চল। এখানেও ভিন্নজাতিগত প্রাধান্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ক্রিয়াশীল। একে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। দাতা মুরব্বী রাষ্ট্র সমূহকে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি, তাদের ক্ষমতা লাভের পক্ষে উত্যক্ত করে চলেছে। সে ক্ষমতা শান্তিচুক্তি ভিত্তিক হলেও তাতে তারা সীমাবদ্ধ থাকছেনা। চুক্তির বাহিরে তারা দাবী জানিয়ে আসছেঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলের আবাসিত বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এবং চুক্তির অন্যতম দফা স্থানীয় আদিও স্থায়ী বাসিন্দাদের

নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে হবে। মুল পাঁচ দফা দাবী নামায় এ দাবীও ছিলো যে, ১৯৪৭ সালের পরবর্তী বসতি স্থাপন কারী বাঙালীদের সবাই অনু প্রবেশকারী এবং তাদের সহায় সম্পত্তি ও বেআইনী। উপজাতীয় বুদ্ধিজীবিরা যুক্তি দেখাচ্ছেন, ১৯৪৭ পর্যন্ত এতদাঞ্চলে বাঙ্গালীদের সংখ্যানুপাতে ছিলো ২.৫০ যা বর্তমানে হয়ে দাঁড়িয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। উপজাতীয়দের ভূমিহীন সংখ্যালঘু করার এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে বাঙ্গালী শাসন প্রশাসনও বাহিনী প্রাধান্য। এসবের উপজাতীয়করন আবশ্যক। নতুবা উপজাতীয়রা নির্যাতন ও অবিচার থেকে রেহাই পাবেনা। বাঙ্গালী উপনিবেশবাদ ও ইসলামী করনে তারা অতিষ্ঠ। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, মানবিক অধিকার ও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

এই এক তরফা অভিযোগের তীব্রতায় তাদের প্রতি অধিকাংশ মুরব্বী রাষ্ট্র সহানুভূতিশীল। তাদেরই চাপের মুখে অসম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং তারাই অবাস্তবায়িত দফা সমূহ বাস্তবায়নে চাপ দিচ্ছেন। এখন বাংলাদেশ কেবল উপজাতীয়দের চাপে জর্জরিত নয়, মুরব্বী রাষ্ট্র সমূহের অসন্তোষবিদ্ধও বটে।

উপজাতীয় রাজনৈতিক বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিপুল অকাট্য যুক্তি আছে, এবং ভুল যুক্তি ও তথ্যের উপর উপজাতীয় দাবী ও আন্দোলন পরিচালিত ও তাতে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়গুলোর আড়াগোড়া পুনর মূল্যায়ন আবশ্যক।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাদের আন্তর্জাতিক মুরব্বীরা, পূর্ব তিমুরের মত গোলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছেন। অশান্তি দমন করার উদ্দেশ্যে তারা প্রথমেই জোর দিচ্ছেন বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার করে, পূর্বাবস্থা বহাল এবং চুক্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকাও সংশোধিত হোক। অতঃপর দাবী উঠবে স্থানীয় রাজনৈতিক আকাঙ্খা নিরূপনে জাতিসংঘের তত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হোক। বাংলাদেশ তো চুক্তির মাধ্যমে ফাঁদে পড়েই আছে এবং সাহায্য নির্ভরতা হেতু মুরব্বী রাষ্ট্র সমূহকে অবজ্ঞা করতে অক্ষম। সুতরাং তার পক্ষে করুন অসহায় অবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকবেনা।

পাকিস্তান ভারত ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মত বাংলাদেশ দৃঢ় হতে পারবেনা। আন্ত র্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তান, ভারত, ইসরাইল; ও ফেলিস্তিনের অবস্থা দৃঢ়। ফেলিস্তিন বাদে বর্ণিত তিন রাষ্ট্র পারমানবিক অস্ত্রের জোরে বলিয়ান। তাদেরকে চাপিয়ে দেয়া মীমাংসায় বাধ্য করা যায়নি, যাবেও না। কিন্তু দরিদ্র দূর্বল বাংলাদেশের সে শক্তি অবস্থান নেই। তার নেতৃ আসনেও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নেই। এ পর্যন্ত তার পক্ষে ঐতিহাসিক ও তথ্যগত যুক্তি প্রদর্শনও সম্ভব হয়নি যে, আত্ম নিয়ন্ত্রনকামী পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়। তাদের আদি জাতীয় ভূমি আরাকান, বার্মা, মিজোরাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি বহিরাঞ্চলে। তারা বৃটিশ আমলের অভিবাসী নাগরিক। এর পক্ষে অকাটা দলিল ও ইতিহাস বিদ্যমান। তাদের প্রতি নির্যাতন ও অবিচার অনুষ্ঠানের দাবী অতিরঞ্জিত। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে তারা অশিক্ষিত অস্বচ্ছল আর পশ্চাদপদ ছিলো। কিন্তু বাংলাদেশ আমলের গত তিন দশক

সময়ের মধ্যে অতি দ্রুততার সাথে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয়দের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার উপজাতীয়দের মাঝে সর্বাধিক। আর্থিক সঙ্গতি আর ভূমি সংস্থানের হার ও তাদের মাঝে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের শহর বন্দর ও রাজধানীর অফিস আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদিতে কর্মকর্তা কর্মচারী ছাত্র শিক্ষক ইত্যাদি পদে উপজাতীয়রা গিজ গিজ করছে। তাদের সাজ পোষাক স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য ঈর্শনীয়। তারা এখন আদিম ও পশ্চাদপদ নয়। এই অঞ্চলে পাকা রাস্তা, বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রচুর। দেশের অলংঘনীয় সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে সমাধিকার, সমান পদ মর্যাদা ও মৌলিক মানবাধিকার সবার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু চুক্তির আওতায় তাতেও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, উপজাতীয়দের সম্পত্তি লাভ, কর্ম সংস্থান, উচ্চ শিক্ষা, জনপ্রতিনিধিত্ব ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার, মন্ত্রীপদ, ও পরিষদীয় চেয়ারম্যান পদে একাধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে। আইনত এটা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য অবিচার।

ভৌগোলিক ভাবে পার্বত্য অঞ্চল, চট্টগ্রামের অংশ। চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী হলো এর আদি বাসিন্দা। স্থানীয় উপজাতীয়রা নিজেদের আদি চট্টগ্রামী লোক বলে দাবী ও করেনা। মগেরা নামেই আরাকানী, মারমারা বর্মী, লুসাই ও মিজোরা মিজোরামবাসী, ত্রিপুরারা ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, চাকমারা মগ বিতাড়িত আরাকানী এবং নিজেদের কথা কাহিনী অনুযায়ী কোন এক অজ্ঞাত চম্পক নগর রাজ্যের প্রতি অনুগত। বাংলাদেশ তাদের জাতিগত স্বদেশই নয়। এখানে উপজাতীয়দেরসবাই আশ্রিত। এ দেশে তাদের সংখ্যা প্রাধান্যের ভিত্তিতে স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকারের প্রয়োগ হতেই পারেনা।

বৃটিশ আইন পার্বত্য শাসন বিধির ৩৫ নং ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৫টি সার্কেলে বিভক্ত করেছে, ৪৬৫২ বর্গমাইল ব্যাপ্ত জাতীয় সম্পত্তি, যা রাষ্ট্রীয় বন, সংরক্ষিত বন, পাহাড়,ও হ্রদ বাসভূমি ইত্যাদি। গোটা ৫০৯৩ বর্গ মাইল সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম তিন উপজাতীয় সার্কেল তথা চাকমা সার্কেল, মং সার্কেল, ও বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নয়। আদিকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহদাংশ জাতীয় বন ভূমি। এখন আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকারের ভিত্তিতে এই গোটা অঞ্চল উপজাতীয়দের প্রাপ্য নয়। তারা দেশীয় জনসংখ্যার মাত্র আধা শতাংশ। তাদের প্রাপ্যভূমির অনুপাত ৫০০ বর্গমাইলের বেশী হয়না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ। এখানকার জাতীয় অঞ্চলে ভূমিহীন বাঙ্গালীদের ব্যবসা বাণিজ্য ও বসতি বিস্তারের অধিকার প্রাপ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬ ও ৪২ ধারা তাদের সে অধিকার মঞ্জুর করেছে।

এটা দুঃখজনক যে, দেশের অখন্ডতা রক্ষায় ইতিহাস, ঐতিহ্য, আইন ও যুক্তিকে কাজে লাগান হচ্ছে না, নিশ্চুপ সময় ক্ষেপন করা হচ্ছে, এবং একদল রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবি উপজাতীয়দেরই মদদ যোগাচ্ছেন, যা আত্মহত্যারই শামিল।

কেউ কেউ এই অভিমত পোষন করেন যে, সেনা মোতায়েন ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের

কারনেই উপজাতীয়রা নিজেদের ভূমি অধিকার ও অস্তিত্ব বিপন্ন মনে করছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এর কোন প্রতিকার না হওয়ার হতাশাতেই তারা বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী। শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হলেও তা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এতে ও অশান্তি অব্যাহত রয়েছে। এখন উপজাতীয়দের সন্দেহ আর অবিশ্বাস না করে, পরিপূর্ণ ভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন করাই সঙ্গত। উপজাতীয় কল্যাণ ও তাদের প্রতি সদিচ্ছা পোষণের আন্তরিকতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে চুক্তির অতিরিক্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ও দেয়া যেতে পারে। যাতে তারা আশ্বস্ত হয় যে, তারা আর ষড়যন্ত্রের শিকার নয়, বাংলাদেশ তাদের প্রতি বাস্তবিকই আন্তরিক।

বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালী ও সেনা প্রত্যাহার, এবং আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চুক্তি না হলেও এগুলো উপজাতীয়দের প্রধান দাবী। তাদের ক্ষোভ অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দমাতে, ও বাংলাদেশের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে, এই অবশিষ্ট দাবীগুলো পূরণ উপকারীহতে পারে। এতদসত্ত্বেও অশান্তি অব্যাহত থাকলে, এবং বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে, চরমপন্থা অবলম্বন যুক্তিযুক্তহবে। ভাবতে হবে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও সেনা মোতায়েন সত্ত্বেও শান্তি সুনিশ্চিত হয়নি। সুতরাং পরীক্ষামূলক ভাবে হলেও বর্ণিত তিন দাবী বাঙ্গালী ও সেনা প্রত্যাহার, চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ও স্বায়াত্তশাসন অধিকার মঞ্জুর করা উচিত। এই চরম উদারতার ব্যর্থতাতেই চরম পন্থা অবলম্বিত হতে পারে।

উপরোক্ত পরামর্শগুলো যথার্থ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সংখ্যাপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠারই পদক্ষেপ হবে বাঙ্গালী প্রত্যাহার, যা বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্থি, এবং তাতে এটাও সুনিশ্চিত হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অবাঙ্গালী প্রধান অঞ্চল। অতীতে তার বাংলাদেশ ভূক্ত হওয়া, এখানকার ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীভূক্ত লোকদের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে নেতিবাচক। স্থানীয় জনমত স্বাধিকারের পক্ষপাতি হলে শান্তি ও কল্যানের স্বার্থে এই দাবীর প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রদেয় হবে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অঞ্চল হওয়ার বলে, তারপক্ষে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ খোলাসা হয়ে যাবে। তৎপর সামরিক নিয়ন্ত্রন ও বাঙ্গালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। বাংলাদেশের এই দশ শতাংশ অঞ্চল, তখন নীতিগতভাবে হবে বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখী। উপজাতীয়রা যে সুযোগে স্বাধীনতা চাইবেনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং বাঙ্গালীও সেনা প্রত্যাহার মানে, এতদাঞ্চল থেকে চরিত্রগতভাবে বাংলাদেশকে প্রত্যাহার করে নেয়া। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অর্জন, এই প্রত্যাহারের দ্বারা বিসর্জিত হবে। দেশ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ এতদাঞ্চলে উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। ঐ মৌলিকতত্বকে বানচাল করার কৌশল বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের এতদাঞ্চলে দূর্বল আর অকার্যকর করে তুলা। এই রাজনীতি ধ্বংসাত্মক। বাংলাদেশের এ ব্যাপারে কঠোর হওয়ার আরো যুক্তি হলোঃ এতদাঞ্চলে উপজাতীয় প্রধান্য কৃত্রিম। তারা স্থানীয় চট্টগ্রাম মুলের লোক নয়, বহিরাগত অভিবাসী বংশধর। নিজ জাতীয় অঞ্চল না হওয়ায়, এতদাঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন প্রাপ্য নয়। তারা দেশীয় জনসংখ্যা

বিস্তারে আপত্তি জানাবার অধিকারীও নয়। এটা তাদের বাড়াবাড়ি। শান্তি স্থাপনে উপজাতীয় বাড়াবাড়ির বিপরীতে গ্রহনীয় উপায় মাত্র ২টি। ১। বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। ২। চট্টগ্রামের সাথে এলাকাগত পুর্নবিন্যাস বা যোগবিয়োগ। অতীতের বিন্যাসেরই ফল পার্বত্য চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সাথে পার্বত্য তিন জেলার এলাকা যোগ বিয়োগ বা পূর্ন বিন্যাস অতি সহজেই করা সম্ভব। কক্সবাজারের পূর্বাংশ আগে পার্বত্য চট্টগ্রামেরই অংশ ছিল। রামুতে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সর্ব প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত, এটি পার্বত্য উপজাতীয়দের দর্শনীয় অন্যতম প্রধান তীর্থ স্থান। পার্বত্যঞ্চলে সীমান্তে অবস্থিত এই উপজেলাটির সাথে বান্দরবান জেলার পুনঃসংযোগ ঘটালে এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যায়ভারসাম্য রচিত হবে।

চট্টগ্রামের পূর্ববর্তী উপজেলা রাঙ্গুনীয়ার দক্ষিনাংশে অবস্থিত শুক বিলাস ও রাজভিলা, যা আগে চাকমা প্রধানদের তরফে শুক রায় দেব নামীয় বন্দোবস্তিভূক্ত এলাকা ছিলো। পরে সেখান থেকে চাকমা রাজবাড়ী উত্তর রাঙ্গুনীয়ার রাজানগরে স্থানান্তরিত হয়। এটি চাকমা ঐতিহ্য মন্ডিত অঞ্চল। রাঙ্গামাটি জেলার সাথে এই অঞ্চলের আংশিক সংযোগ ঘটালেও উপজাতীয় সংখ্যাধিক্যের অবসান হবে। খাগড়াছড়িপার্বত্য জেলার পশ্চিম সীমান্ত বর্তী উপজেলা হলো উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি। এটি অনেকাংশে পাহাড়ময় ও উপজাতি অধ্যূষিত। এই অঞ্চলটি আংশিকভাবে রামগড়, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ির সাথে জুড়ে দিলে, খাগড়াছড়ি জেলায় ও উপজাতীয় সংখ্যাধিক্য লোপ পাবে।

এলাকা বিন্যাসের এই কৌশল অবলম্বন করা হলে,বাঙ্গালী পুর্নবাসন বা বসতি বিস্ত ারের প্রয়োজন হবেনা। এমনিতেই স্থানীয় বাঙ্গালী অধিবাসীদের দ্বারা উপজাতীয়রা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যাবে, এবং এটি ত্বরিত গতিতে করাও সম্ভব। তৎপর সংবিধান পরিপন্থী আইন ও চুক্তি ধারা সমূহ ঝেড়ে ফেলাও গনতন্ত্রকে বিনা বাধায় কার্যকর করা হবে সহজ। বিদ্রোহ আর বিচ্ছিন্নতাকে এভাবে অসম্ভব করে তুলার পথ অবলম্বনই একান্ত দরকার। এ পথে সময় ক্ষেপন মারাত্মক।

পার্বত্য সমস্যার সমাধান কী ?

বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা সমূহের মাঝে অন্যতম বড় সমস্যা হলো, পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তির বিষয়টি । এর পক্ষে এ পর্যন্ত দুবার দুটি বড় ধরনের সরকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে । কিন্তু তাতে উপজাতীয় অসন্তোষের পুরাপুরি সুরাহা এখনো হয়নি । এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে জাতিগত ভিন্ন অবস্থানের সমস্যাটি, যা বিগত আওয়ামী সরকারের সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি ও এরশাদ সরকারের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের দ্বারা সৃষ্ট । এই চুক্তি ও আইনের বলে উপজাতিরা হয়েছে সংরক্ষিত পদের অধিকারী ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সুবিধাভাজন, আর বাঙ্গালীরা তাদের প্রতিপক্ষ অবহেলিত সমাজ । এই বৈষম্য আর অগণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা এশাধারে সংবিধান বিরুদ্ধ তো বটেই, সাম্প্রদায়িক শান্তি রচনার পক্ষে ও তা সহায়ক নয় ।

বিএনপি সরকার গত ১৯৯১-৯৬ সালে স্বীয় কার্য কালে শান্তি স্থাপনে, বিদ্রোহী উপজাতীয় সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সংলাপ চালিয়ে ও কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেনি । পরিপূর্ণ মীমাংসার আশায়, ইতিপূর্বে এরশাদ সরকার প্রদত্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মঞ্জুরকৃত উপজাতীয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও কোনরূপ যোগ বিয়োগ করা থেকে সে বিরত থাকে । বিএনপি কোনরূপ শূণ্যতা সৃষ্টি করতে চায় নি, এবং কোন উগ্রতাকে ও প্রশ্রয় দেয়নি । এ কারণেই তার নির্বাচনী ইশতেহারে আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার উপর জোর দেয়া হয় । যদি ও তার পূর্ব ঘোষিত নীতি ছিলোঃ আওয়ামী শান্তি সংলাপের সাথে শরিক না হওয়া, পার্বত্য শান্তি চুক্তি প্রত্যাখান ও বাতিল করা । এই উদ্দেশ্যেই সে চুক্তিটিকে কালো চুক্তি নামে আখ্যায়িত করেছিল । তবে দায়িত্বশীল বিবেচনায় সে নিজ পার্বত্যনীতিকে নতুন পরিস্থিতির আলোকে পুনরায় ঢেলে সাজিয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে ২০০১ সালের প্রচারিত নির্বাচনী ইশতেহারে । এই সাথে সে উপজাতীয় সমাজে স্বীয় আসন পাকা পোক্ত করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি আসনে একজন প্রাক্তন শান্তিবাহিনী কর্মকর্তা মনি স্বপন দেওয়ানকে এবং বান্দরবান আসনে মারমা নেত্রী মামা চিং কে মনোনয়ন দিয়ে প্রমাণ করেছে, সে উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী নয় । তিন আসনের অপরটি খাগড়াছড়িতে আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়াকে মনোনয়ন দানের দ্বারা পার্বত্য বাঙ্গালীদের স্বার্থে ভারসাম্য রচনাই তার লক্ষ্য হওয়া ব্যক্ত হয়েছে । তার পার্বত্য নীতিতে কোন একতরফা ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি । উভয় পাক্ষিক রাজনৈতিক আশ্বাসই ব্যক্ত

হয়েছে তার নির্বাচনী নীতি আদর্শ সম্বলিত ইশতেহারে। সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি এখানে বিবেচ্যঃ

"শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আওয়ামী লীগ সরকার গোপনে ও জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে, সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য পূর্ণ যে চুক্তি করেছে, তা এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে সমস্যাটির সংবিধান সম্মত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।"

এই নীতি আদর্শের ভিত্তিতে বিএনপি দুই বিজয়ী এমপি মনি স্বপন দেওয়ান ও আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়ার প্রধান দায়িত্ব হলোঃ মীমাংসার ফর্মূলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, যে ফর্মূলা হবে পাহাড়ী বাঙ্গালীর বৈরীতা নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে জোরদার করা, ও সম্প্রীতি রচনা। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পাহাড়ীর সংখ্যা সাম্যকে বজায় রাখা। ক্ষমতা থেকে সংরক্ষণবাদকে বিদায় করে গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির প্রতিষ্ঠা। সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে একের অগ্রাধিকার আর অপরের বঞ্চনা নয়, বরং দেশ ভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে বর্ধিত মঞ্জুরী অর্জন। ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে মিয়াদ ভিত্তিক বারি প্রথা আরোপ তথা বিরতি মানা এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের বিকল্প পদের সংস্থান করা, যাতে বারি ভিত্তিক বিরতি কালে, ক্ষমতার ভাগ বিপক্ষেরও নাগালে থাকে।

এই পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা একা পাহাড়ীরা নয়, সমান সংখ্যক বাঙ্গালীরা ও তাদের প্রতিবেশী। যদি বাঙ্গালীদের অস্থানীয় সেটেলার অখ্যায়িত করে, তাদের প্রত্যাহারের দাবীতে পাহাড়ীরা সোচ্চার ও আন্দোলন মুখর থাকে, তা হলে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় স্থানীয় বাঙ্গালীরাও এ বলে মুখর হবে যে স্থানীয় পাহাড়ীরা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়,তারা অবাংলাদেশী অভিবাসীদের বংশধর। তাদের বাঙ্গালী প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো চট্টগ্রাম নামীয় ভৌগোলিক অঞ্চলেরই অংশ, এবং এই গোটা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হলো চট্টগ্রাম মূলের লোক। পাহাড়ীদের বাংলাদেশী নৃতাত্বিক মৌলিকত্ব নেই। এই যুক্তির ভিত্তিতে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী, ও চট্টগ্রামী সহ বহিরাগত অপর বাঙ্গালীদের স্থানীয় নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হলো ইচ্ছাকৃত বৈরীতা। পাহাড়ীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার পক্ষে এরূপ অসহনশীলতা মোটেও উপযোগী নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার বাসিন্দা উপজাতিদের সম্পর্কে বিএনপির উদার মনোভাব তার নির্বাচনী ইশতেহারে অত্যন্ত যৌক্তিক ও নমনীয় ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে পূর্ববর্তী কঠোরতার লেশ মাত্র নেই। এই মনোভাবকে স্বাগত জানিয়ে উপজাতীয় পক্ষকে ও নমনীয় হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে, পার্বত্য চুক্তিতে ইতিহাস ও সংবিধান লঙ্ঘনের মত গুরুতর ত্রুটির অবতারনা হয়েছে, যা সংশোধন করা ছাড়া উপায় নেই। জাতি ও রাষ্ট্রের অখন্ডতা আর সার্বভৌমত্বকে ও চুক্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে, যে ব্যাপারে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

চুক্তির মুখবন্ধে সুন্দর করে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পুর্ণ ও অবিচল অনুগত্য বজায় রেখে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত, এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই চুক্তি সম্পাদন করেছেন ।

এই মুখবন্ধই চুক্তির মূলনীতি, এবং তৎসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষই অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখানে পালনীয় মূলনীতি আর অঙ্গিকার হলোঃ

(ক) চুক্তিটি হবে সংবিধান সম্মত ঃ

(খ) তাতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আর অখন্ডতা লঙঘন করা হবে না ।

(গ) পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস ও অবস্থানকারী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও উন্নয়ন সমুন্নত ও ত্বরান্বিত করা হবে ।

চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় উপরোক্ত তিন অঙ্গিকার ও মূলনীতি পালন করতে বাধ্য । যদি চুক্তির বিষয়বস্তু, ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এর ব্যতিক্রম হয়, তা হলে তা সংশোধন যোগ্যক্রুটিরূপে গণ্য হবে । অঙ্গিকার ও মূলনীতির খেলাপ ক্রুটি সমূহ অবশ্যই সংশোধন যোগ্য ।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, চুক্তির বহু দফাতেই সংবিধানের নীতি নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে । রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা আর অখন্ডতা অক্ষুণ্ন থাকে নি, এই সমালোচনা ও অভিযোগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হলোঃ

<u>ক) সংবিধান লঙঘন ঃ</u>

১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১-এ বলা হয়েছে ঃ (উপ অনুচ্ছেদ) (১)

"বাংলাদেশ এশটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে ।"

এই আইন ও আদেশ বলে বাংলাদেশ হলো একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র । এতে ফেডারেল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরোপ যোগ্য নয় । গোটা দেশ একটি একক রাজনৈতিক কাঠামোতে আবদ্ধ । তাতে কেবল প্রশাসনিক ভাগ বিভাগই আঞ্চলিক পরিচিতির ভিত্তি । রাজনৈতিক অঞ্চল ও শাসন প্রশাসনের পরিবর্তে এই একক কাঠামোতে প্রশাসনিক অঞ্চল ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক স্থানীয় শাসন বা সরকার পদ্ধতি সাংবিধানিক ভাবে অনুমোদিত, যথাঃ

<u>অনুচ্ছেদ নং ঃ ৫৯ (১) ঃ</u>

"আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে ।"

এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিপরীতে প্রশাসনিক এলাকা ডিঙ্গিয়ে কোন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান গড়ার কোন সংস্থান নেই। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে, যা কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয়। সুতরাং এটি সংবিধান বহির্ভূত ব্যবস্থা।

<u>(২) অনুচ্ছেদ নং ২৭ (মৌলিক অধিকার) ঃ</u>

"সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"

<u>(৩) অনুচ্ছেদ নং ২৮ (১) মৌলিক অধিকার) ঃ</u>

"কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।"

(২) রাষ্ট্র বা জন জীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেন না।"

<u>(৪) অনুচ্ছেদ নং ২৯ (১) (মৌলিক অধিকার)ঃ</u>

"প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

এই বিধান গুলো মৌলিক অধিকারযুক্ত তো বটেই, এর বিপরীতে আইন প্রণয়নের সাংবাবিধানিক নিষেদ্বাজ্ঞা ও আছে যথা ঃ

" <u>অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১)</u> (মৌলিক অধিকার) এই (তৃতীয়) ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই সংবিধান প্রতর্বন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি ব্যতিল হইয়া যাইবে।"

"(২) রাষ্ট্র এই ভাগের বিধানের সহিত অসামঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না, এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

<u>"অনুচ্ছেদ নং ৭ (১)</u> প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"

"(২) জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবধিান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

<u>অনুচ্ছেদ নং ১১</u>। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মুল্যের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ নিশ্চিত হইবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

উপরোক্ত সাংবিধানিক নীতি নির্দেশের দ্বারা প্রথমেই প্রচলিত আইন ছিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধুলিস্বাৎ হয়ে যায় । স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চীফশীপ তো থাকেই না, শাসন প্রশাসনে ও আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটে ।

প্রচলিত আইনের দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘনকে এ পর্যন্ত পরোয়াই করা হয়নি । তদুপরি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অসাংবিধানিক চুক্তি ও আইন, যা স্ববিরোধী ও বটে । এই অসাংবিধানিক চুক্তি ও আইনের পক্ষে সংবিধান থেকে গৃহীত পুঁজি হলোঃ অনুচ্ছেদ নং ২৮ এর উপ অনুচ্ছেদ (৪) যাতে বলা হয়েছে ঃ

"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ণ হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।"

এখানে বিবেচ্য যে উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত অনগ্রসর নাগরিকদের সবাই এই উপ অনুচ্ছেদ বলে উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে বিশেষ বিধান লাভের অধিকারী । এই বিশেষ বিধান লাভের বেলায়, উপজাতি অউপজাতি বৈষম্য আরোপের কোন সুযোগ নেই । এ ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বর্ণ, গোষ্ঠী ইত্যাদির তারতম্য করা, পদ সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধায় অগ্রাধিকার দান, কোনক্রমেই অনুমতি যোগ্য নয় । কিন্তু চুক্তি ও পার্বত্য আইনে উপজাতি আর অ উপজাতি সত্তার ক্ষেত্রে তারতম্য করা হয়েছে । সংবিধানভূক্ত তৃতীয় ভাগের আইন গুলো মৌলিক অধিকার সম্পন্ন । এগুলো লঙ্ঘন ও এগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধি বিধান প্রণয়ন নিষিদ্ধ তো বটেই, অনুরূপ আইন ও বিধি বিধান রচিত হলেও তা অকার্যকর ও বাতিল গণ্য হবে । অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) খোদ ঐ মোলিক অধিকার ভূক্ত অলঙ্ঘনীয় আইন হলেও তদ্বারা অন্যান্য মোলিক অধিকার লঙ্ঘন অনুমোদিত নয়, এবং ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নারী ও পুরুষে বৈষম্য আরোপের সুযোগও নেই । এই অনুচ্ছেদ সবার জন্য রক্ষা কবচ ।

খ) চুক্তি ও পার্বত্য আইনের বিধান হলো ঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল । কিন্তু তথ্য উপাত্ত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর মিশ্র অধ্যুষিত অঞ্চল । সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ এই দেশটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে আখ্যায়িত করেছে । এটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, যা রাজনৈতিক সাম্প্রাদয়িক ও অঞ্চল ভিত্তিতে বিভক্ত নয় । অনুচ্ছেদ নং ৬ (২) নাগরিকদের অখন্ড বাংলাদেশী জাতি রূপে আখ্যায়িত করেছে । সুতরাং আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রাদয়িকতা নিষিদ্ধ । এই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে পার্বত্য চুক্তিতে বাংলাদেশী জাতিভূক্ত লোকজন উপজাতি আর অউপজাতিতে বিভক্ত, আর দেশের এতদাঞ্চল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইউনিট না হওয়া সত্ত্বেও, এক বিশেষ অঞ্চল রূপে চিহ্নিত । সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পৃথক পরিচয় অনুচ্ছেদ নং ২৩ এর পরিপন্থী না হলেও জাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিকতাই চর্চনীয় । নতুবা জাতীয় আর রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষা হবে কঠিন । সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একক ভাবে উপজাতি অধ্যূষিত অঞ্চল বলা জাতি ও দেশের অখন্ডতার পরিপন্থী অসাংবিধানিক ব্যবস্থা ।

২। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অনুমোদিত। অথচ, প্রশাসনিক ইউনিট ভিত্তিতে জেলা পরিষদই সংস্থান যোগ্য, যথা অনুচ্ছেদ নং ৫৯। আঞ্চলিক পরিষদ ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়, দেশের সব জেলার জন্য অভিন্ন জেলা পরিষদ আইন এখনো রচিত ও কার্যকর হয়নি। বিশেষ অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর বৈষম্যের সৃষ্টি করবে, যা অনুচ্ছেদ নং ২৭ ও ২৮এ নিষিদ্ধ। আগামীতে সাধারণ জেলা পরিষদ আইন এই তিন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত না হলে, স্থানীয় বর্ধিত সুযোগ সুবিধা আর অগ্রাধিকারের ব্যাপারটি দেশ জুড়ে, অশান্তি উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। সাম্প্রদায়িক পদ সংরক্ষণ ও আসন কোটা ভিত্তিক নির্বাচনের স্থানীয় বিধি বিধানটিও আইন সম্মত নয়। অবাধ অসাম্প্রদায়িক নির্বাচনই হলো আইন। জনগণের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায় ও প্রতিনিধিত্বই অনুচ্ছেদ নং ১১ তে প্রাধান্য পেয়েছে। তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও সংরক্ষণ বাদের কোন স্থান নেই। এই আইনী বিবেচনায় কেবল জেলা পরিষদ টিকে থাকতে পারলে ও, তার নির্বাচন পদ্ধতি অনুমোদনীয় নয়। মন্ত্রী পদ, চেয়ারম্যান পদ, সদস্যপদ আইনতঃ অবাধ আর অসংরক্ষিত। এর কোন ব্যতিক্রম মান্য নয়। কোনরূপ অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন মূল নির্বাচনী আইন অনুমোদন করে না। অথচ আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন ব্যবস্থায় তাই গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ব্যতীত অন্যদের ভোটাধিকার বাতিলের ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ নং ১২১ ও ১২২ অনুসারে গ্রহন যোগ্য নয়। প্রত্যেক বৈধ বাংলাদেশী নাগরিক সে নিজ বসবাস ও কর্মক্ষেত্রে ভোট প্রার্থী ভোটার তালিকা ভূক্ত হওয়ার ও নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। অনুচ্ছেদ নং ১১ অনুযায়ী এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। পার্বত্য চুক্তি ও পরিষদ আইনে প্রণীত ভিন্ন বিধি বিধান তাই অসাংবিধানিক।

৩। তিন উপজাতীয় রাজা বা সার্কেল চীফের নিযুক্তি হলো ঔপনিবেসিক সামন্তবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং ১ ও ১১ এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে না। আইনতঃ জনগণের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নেই। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে তারা পদাধিকার বলে স্থায়ী বাসিন্দা সদনপত্র প্রদান, পরিষদে আসন গ্রহন ও বক্তব্য দানের অধিকারী। ভুমি কমিশনে ও তারা পদাধিকার বলে অন্তর্ভূক্ত সদস্য।

জমি বন্দোবস্ত, মালিকানা, ব্যবসা বাণিজ্য, আর কর্ম সংস্থানে উপজাতীয় অগ্রাধিকার, বাঙ্গালীদেরকে অবিচার ও বঞ্চনার অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। তাদের বাঙ্গালী পরিচয়টা ও অস্বীকৃত। উপজাতিদের একটি সাম্প্রদায়িক তালিকা আছে, কিন্তু অউপজাতিদের কোন তালিকা নেই। সুতরাং অউপজাতীয় স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের পরিচয়টা ও বিতর্কিত। দয়া করে রাজা বাবুরা প্রজা বলে স্বীকার করলেই মাত্র রক্ষা। এরূপ ভাগ্যবান বাঙ্গালীদের তালিকায় সেটেলার বাঙ্গালীরা নেই।

রেড ক্লিফ রোয়েদাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বলে নয়। বাঙ্গালী আধিপত্যের বলে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে

বাঙ্গালী সংখ্যাধিক্য ছিলো না। সুতরাং এতদাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে টিকে থাকার উপায় মাত্র দুটি। একঃ উপজাতিদের স্বেচ্ছায় বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করে থাকা। দুইঃ স্বপক্ষীয় জনশক্তি বাঙ্গালীদের পৃষ্ঠপোষন ও শক্তিবৃদ্ধি।

ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম উপায়টি নির্ভরযোগ্য নয়। শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উপজাতিরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, দীর্ঘ আড়াই দশক কাল উৎপাত করেছে। পার্বত্য চুক্তির অধীনে তাদের আত্মসমর্পণ, স্থায়ী শান্তি গ্রহণ কিনা তা অনিশ্চিত। এতদাঞ্চলের বিদ্রোহ সাময়িক বিরতি গ্রহণ করেছে মাত্র। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পক্ষে এই সুযোগে স্বপক্ষীয় জনশক্তি পোষণই সমাধান। স্থানীয় বাঙ্গালী জন শক্তির পৃষ্ঠ পোষন ছাড়া তা কখনো সম্ভব নয়। বাঙ্গালী আবাসন না গড়ে ও এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

দাম্পত্য আর যৌন সম্পর্ক রচনায় এতদাঞ্চলীয় উপজাতীয় সমাজের কোন কোন সম্প্রদায় উদার, আর কেউ কেউ কিছুটা রক্ষণশীল। সাধারণ চাকমারা এ ব্যাপারে আধা শুদ্ধাচারী। মারমা, মগ রোয়াঙ্গ্যা ও রাখাইনরা অপেক্ষাকৃত উদার। ত্রিপুরাসহ অন্যান্যরাও অসামাজিক যৌনাচার ও বহির্বিবাহে অভ্যস্ত। আংশিক শুদ্ধাচার, ও সমাজমুখী যৌন রীতি উজজাতীয় সমাজে প্রচলিত। সমাজপতি, অভিজাত, আর শিক্ষিতদের মাঝে আন্তঃসমাজ দাম্পত্য সম্পর্ক প্রায় প্রচলিত। উঁচু মহলে বর্হির্বিবাহ প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাধারণের মাঝে অনুরূপ ঘটনা উত্তেজনার কারণ হয়। আর এ ব্যাপারে প্রতিবাদী ভূমিকা উঁচু মহলের দ্বারাই পালিত হয়। রাজনৈতিক কারণে চাকমা দুহিতাদের সাথে বাঙ্গালী মুসলিম পাত্রদের বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক অধিক আপত্তিকর। যদিও প্রেমঘটিত কারণে অনুরূপ সম্পর্ক রচনার ঘটনা মাঝে মধ্যে ঘটে এবং তা প্রচুর সাম্প্রদায়িক উত্তাপ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অনুরূপ উত্তেজনাকর প্রধান ঘটনা হলো : সম্ভবতঃ ১৯৫৩ সালে সংঘটিত মকতুল হোসেন ও অমীয় বালা চাকমার পারস্পরিক প্রেম ও পলায়নের ঘটনা এবং তা থেকে চাকমা রাজ আদালতে চলমান সামাজিক মামলা ও তার উত্তেজনাকর পরিণতি। বিচার চলাকালে তখনকার যুবক রাজা ত্রিবিদ রায়, আসামীদ্বয়ের পক্ষে সমবেত উৎসুক বাঙ্গালী জনতার প্রতি, যুবা সুলভ উত্তেজনা বশতঃ বন্দুক তাক করেন, এবং সম্ভবতঃ গুলিও ছুড়েন। তাতে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে কতোয়ালী থানার তখনকার দারোগা সোনা মিয়া তাকে গ্রেফতার করেন। পরে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে রাজা বাহাদুর মুক্তি পান ও প্রেমিক যুগলের বিবাহ অনুমোদিত হয়। এটা উল্লেখ্য যে, খোদ চাকমা রাজা, স্বীয় সহোদরা, এবং পিতৃব্যজাত ভাইবোনদের অনেকেই, বাঙ্গালী ও বিজাতীয় রক্তের অংশীদার। তাদের অধিকাংশ নিজেরাও বাঙ্গালীসহ বহির্বিবাহে আবদ্ধ।

এটা আনন্দ আর গর্বের বিষয় যে, প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায়, স্বীয় প্রথম পুত্র নলিণাক্ষ রায়কে কুলিন হিন্দু ব্যারিষ্টার সরল কুমার সেনের বিদুষী কন্যা শ্রমতি বিনীতা সেনের সাথে এবং দ্বিতীয় পুত্র বীরুপাক্ষ রায়কে আরেক কুলিন হিন্দু জমিদার ভবেন্দ্র নারায়ণ ভূপের কন্যা শ্রীমতি সুধীরা ভূপের সাথে বিবাহ দেন। এই দুই বৈবাহিক সূত্রেই সর্বপ্রথম চাকমা রাজ পরিবার ভারতীয় কৌলিন্যে উন্নীত হোন। ঐ দুই কুলিন মহিলার সম্পর্কের গুণেই আদিম জুম ঐতিহ্যের ধারক চাকমা রাজপরিবার এবং তৎসূত্রে আংশিক গোটা চাকমা সমাজ আভিজাত্যে উন্নীত। নতুবা অদ্যাবধি জুমিয়া পশ্চাদপদতা, আর অনুন্নত জীবনচর্চাই হতো চাকমা আভিজাত্যের ভাগ্য। মুসলিম বা হিন্দু ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীতে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যম হলো তাদের আদব-কায়দা ও জীবন মানে অভ্যস্ত হওয়া, এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন। এই বিচারে আদিম বন্য সংস্কৃতি উন্নত মর্যাদার বাহন নয়। তাই রাজা ভুবন মোহন রায় নিজ পরিবারকে কুলিন মান প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তাদের অতীত মুসলমানদের সাথেও আত্মীয়তায় আবদ্ধ বলে মনে করা হয়।

বহির্বিবাহে সাধারণ অনীহা সত্ত্বেও বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে বিজাতীয় পাত্রদের সাথে চাকমা পাত্রীদের এমন লোভনীয় প্রচুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, যা উক্ত সমাজের পক্ষে গর্বের বিষয়। উচ্চ শিক্ষিত পদাধিকারী ও সংস্কৃতিবান ঐসব পাত্র, তাদের পক্ষে সাধারণভাবে দুষ্প্রাপ্য। নিঃসন্দেহে পাত্রপক্ষ ঐ সম্পর্কগুলোর দ্বারা উপকৃত হয় না। বিবাহের দ্বারা শুধু দুই-পাত্র-পাত্রীর জোড় বাধাই নয়, তাতে তাদের সাথে সম্পর্কিত একদল আপনজনের পারস্পরিক মধুর আত্মীয়তা ও রচিত হয়। সামাজিকতা পানাহার, সাজ-পোশাক, একাত্মতা, মজলিসদারী, রুচি- বিলাসিতা ইত্যাদি অনেক কিছুর চর্চা এর সাথে জড়িত। রং রূপ ও সাময়িক ব্যক্তিগত ভাললাগার বাহিরে, তৃপ্তিকর অনেক কিছুই জীবনসাথীর মাধ্যমে প্রাপ্য হয়। আচার ব্যবহার, আদব কায়দার অভিজাত উন্নত ধারাটিও এই পাওনার সাথে যুক্ত। বাঙ্গালী পাত্রকে এসব অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করেই, সাময়িক উত্তেজনার বশে উপজাতীয় পাত্রীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হতে হয়। পরিণামে এসব সম্পর্ক খুব কমই সার্বিক অর্থে সুখকর হয়ে থাকে। বিধর্মীয় সমাজে মুসলিম পাত্রী দান, ধর্ম ও সামাজিক নীতিতে নিষিদ্ধ। তাই অনিহার মধ্যেও বিজাতীয় পাত্রী গ্রহণের বিপরীতে, তাদের কাছে মুসলিম কন্যা দান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ধর্মীয় সমীকরণ ছাড়া কোন পাত্রের সাথেই, কোন মুসলিম পাত্রীর বিবাহ, সমাজে স্বীকৃত নয়। ধর্ম ও সমাজের এই কড়া নিষেধাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তাই বিজাতীয় পাত্রীরা মুসলিম সমাজের পাত্র গ্রহণে সক্ষম হলেও বিনিময়ে বিজাতীয় পাত্র, কোন মুসলিম পাত্রী গ্রহণে কমই সক্ষম হয়। মুসলমানদের এই একতরফা সম্পর্ক রচনার কড়াকড়ি ধারা, বিজাতীয়দের সাথে রক্ত-মাংসের আত্মীয়তা রচনার পক্ষে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এ কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে চাকমাদের আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠলেও, মুসলমান সমাজ থেকে তারা দূরে অবস্থিত। হতে পারে মুসলমানদের সাথে তাদের অনাত্মীয় আচরণের এটাও অন্যতম কারণ। এটা অবশ্য সুফলদায়ক ও বটে। নতুবা বাঙ্গালী মুসলিম জনসংখ্যার এক শতাংশের ভগ্নাংশ সংখ্যক চাকমাদের পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হতো। বিপরীতে অমুসলিম বাঙ্গালীরা আত্মীয়তা সূত্রে উপজাতিদের সাথে অধিক ঘনিষ্ট।

এতদ কারণে ধীর ও স্বল্প সংমিশ্রণ ধারায় চাকমাসহ অন্যান্য মঙ্গোলীয়রা ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালীধর্মী তীক্ষ্ণতা ও মালিন্যে ভূষিত হচ্ছে। এভাবে ধীর গতিক শারীরিক বিবর্তন বাস্তবায়িত হওয়াতে এখন অবিমিশ্র মঙ্গোলীয় চরিত্র তাদের মাঝে প্রায় অপসৃয়মান।

চাকমাদের মাঝে বিজাতীয় পাত্র গ্রহণের সামাজিক অনীহা ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও, সমাজের বাধ্যগত অনুমোদনক্রমে বিজাতীয় অনুপ্রবেশ ঘটার সাম্প্রতিকতম ঘটনা হলো জীপতলী মৌজায় নতুন এক সাপ্যা গোষ্ঠীর উদ্ভব। কোন এক ইংরেজ কর্তৃক জনৈকা চাকমা মহিলাকে বিবাহ করার মাধ্যমে জন্মপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততির দ্বারা গত

প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে, এই গোষ্ঠীটির উদ্ভব হয়েছে। ইতোপূর্বে দাজ্যা ও চেক কাবা ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলোর মুসলিম পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে উদ্ভুত হওয়া সম্ভব। গোষ্ঠীগুলোর নামকরণের ভিতরই সে রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত। চেক কাবা মানে খতনাকৃত আর দাজ্যা মানে দাড়িওয়ালা। বিরল শ্মশ্রু চাকমাদের দাড়ি রাখা ও খতনা করা রীতি নয়। এটা মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্য।

যে সব মঙ্গোলীয় পাত্রী, বহির্বিবাহের দ্বারা সমাজ ত্যাগ করেছে, তারা নিজেদের সন্তানাদিসহ ভিন্ন সমাজে সংযোজিত হয়েছে। তাদের স্বসমাজ তদ্বারা নৃতাত্ত্বিকভাবে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। তবে ভিন্ন সমাজের যে সব পাত্র ও তাদের সন্তানাদি তাদের সমাজের ভিতর অবস্থান করছে তারা রং ও গঠনে মঙ্গোলীয় চরিত্রকে প্রভাবিত করছে। এ জাতীয় সংকর জন্মধারার দ্বারা, নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন ঘটা অনিবার্য। এসব ক্ষেত্রে সন্তানাদির মাতৃ বা পিতৃ সাদৃশ্য লাভ অথবা মিশ্র রং ও গঠন ধারণ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অনুরূপ বিবর্তনের জীবন্ত মডেল হলো বড় য়া সম্প্রদায়। তাদের মাতৃ ও পিতৃ ধারায় বাঙ্গালী ও মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ ঘটার প্রমাণ শুধু তাদের রং ও গঠনেই সিমাবদ্ধ নেই, পূর্ব পুরুষদের মিশ্র নাম তালিকায়ও নিহিত পাওয়া যায়। মনে করা হয়, তাদের অধিকাংশ মগ বংশোদ্ভুত।

অনাকাঙ্খিত হলেও চাকমাসহ অন্যান্য মঙ্গোলীয়দের বহির্বিবাহ আজকাল সীমিত নেই। মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য ভিন্ন সমাজের সাথে তাদের পাত্র-পাত্রী আদান প্রদান প্রায় চলমান। এই ধারা পারস্পরিক সম্প্রীতি রচনার সহায়ক হলেও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আজকাল চাকমা সমাজে মুসলিম নামকরণ প্রথা রহিত। নতুবা আজকাল তারা নামে খেতাবে ভাষাও ব্যবহারে মুসলিম চরিত্র সম্পন্ন অন্যতম সম্প্রদায় বলে গণ্য হতো। নামে অমুসলিম মঙ্গোলীয় চিহ্নিত হওয়ার সরল প্রথা বৃটিশ আমলেই প্রবর্তিত হয়, যে ধারা অদ্যাবধি আমলা মহলে মান্য। অতীতে মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণ করে, এতদাঞ্চলীয় চাকমা সর্দারেরা স্বসমাজ ও সম্প্রদায়ের কর্তা হিসাবেও স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু আজকাল সে স্বীকৃতির অবসান ঘটেছে। যদ্দরুণ মুসলিম নাম ও খেতাব, স্থানীয় চাকমা সমাজ থেকে এখন বিলুপ্তই বলা যায়।

এটা অনস্বীকার্য যে, উদার ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা ভুবন মোহন রায়, স্বীয় দুই পুত্রকে দুই বিদুষী ও কুলিন হিন্দু মহিলার সাথে বিবাহে আবদ্ধ করে, অনুন্নত আর অবহেলিত চাকমা সমাজকে কৌলিন্য দান করেছিলেন। সেই সূত্রেই চাকমা সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতি আর উন্নত জীবনচর্চার সূত্রপাত হয়; এবং স্থানীয় মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে আর্য্য রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে।

ঐ আর্য্য রক্তের সংমিশ্রণের ধারায় নতুন এক অভিজাত প্রজন্মের উদ্ভব ঘটেছে। ঐ কৌলিন্যের ধারাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আরো অনেক বিজাতীয় মহিলার আগমনে ঐ সমাজ বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে, যাদের মাঝে চতুর্থ উল্লেখযোগ্য

হিন্দু মহিলা হলেন মিসেস সুদীপ্তাদে ওরফে দেওয়ান। অনেকের মাঝে বিশেভাবে এই মহিলা তার রাজনৈতিক অবদানের গুণেই আজ স্মরণীয়। সংসদীয় রাজনীতির শুরুকাল থেকে, এই পর্বতাঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী, বাবু কামিনী কুমার দেওয়ান, রাজা ত্রিদিব রায়, রাজা মংশোয়ে প্রু চৌধুরী, অংশোয়ে প্রু চৌধুরী, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, চাই থোয়াই রোয়াজা, উপেন্দ্রলাল চাকমা ও বিনয় কুমার দেওয়ানের সম্মিলিত রাজনৈতিক অবদানের তুলনায় বাংলাদেশ আমলের প্রথম মহিলা সংসদ সদস্যা মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ানের অবদান বেশী। এতদাঞ্চলের মঙ্গোলীয় সমাজ তার কাছে ঋণী। একমাত্র তারই একক তৎপরতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোটা ও অগ্রাধিকারের সরকারী ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। যদ্দরুণ উক্ত সমাজে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার সারা বাংলাদেশে এখন সর্বাধিক। বিদ্রোহ, অশান্তি ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক চমক মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ানের উপর টেক্কা দিলেও, গঠনমূলক রাজনৈতিক সাফল্য, এই হিন্দু মহিলার সর্বাধিক। তাই উপজাতীয় সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে, আরো অধিক বাঙ্গালী নারী পুরুষের সমাবেশ ঘটা ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী, এ দাবী করা অযৌক্তিক নয়।

একদা চাকমা সমাজ, অধিক কৌলিন্যের অহমিকায় সহযোগী অন্যান্য মঙ্গোলীয় সম্প্রদায়গুলো থেকে রক্ত সম্পর্ক বাঁচাতে সচেষ্ট থাকতো। নেহাত বাধ্য হওয়া ছাড়া ত্রিপুরা ও মগদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রচিত হতো না। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো তো এক্ষেত্রে অদ্যাবধি অপাংক্তেয় গণ্য।

ত্রিপুরাদের সাথে চাকমাদের অতীতে কখনো সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে সারা অতীত জুড়ে মগ সম্প্রদায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বৈরী। তাই এতদোভয়ের মাঝে স্বাভাবিক আত্মীয়তা রচনা সহজ ছিলো না। বিংশ শতাব্দীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বাঙ্গালীদের মোকাবেলার প্রয়োজনে সমুদয় উপজাতীয় সমাজের ঐক্য আর সহযোগিতা কাম্য হওয়ায়, তাঁরা পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য রচনায় উৎসাহী হোন এবং তা থেকেই অধুনা আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের বিধি-নিষেধ অনেকখানি শিথিল। এখন আর মগ ত্রিপুরা ও চাকমাতে আত্মীয়তা সামাজিকভাবে বর্জ্য নয়। তবে এখনো অন্যান্য অনুন্নত ছোট-সম্প্রদায়গুলো তাদের সমান কৌলিন্যে উন্নীত হতে পারেনি। তাই তাদের সাথে বর্ণিত তিন প্রধান সম্প্রদায়ের পাত্রপাত্রী আদান প্রদান প্রায় বিরল। সামাজিক ক্ষেত্রে ছোট সম্প্রদায়গুলো বড়দের কাছে এখনো তুচ্ছ।

তিন প্রধান সম্প্রদায়ের সমাজপতি তিন রাজগোষ্ঠীতে পাত্র-পাত্রী আদান প্রদানের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রপাত হিসাবে বিংশ শতব্দীতে মাং রাজ দুহিতা হানুমা চৌধুরীরাণী ওরফে কিরণশশীর সাথে বোমাং রাজবংশীয় কংলা চাই চৌধুরীর বিবাহ এবং তাদের পুত্র মং প্রুসাঁই চৌধুরীর সাথে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের দুহিতা,

নীহার বালা দেবীর বিবাহ এবং বোমাং রাজা মংশোয়ে প্রু চৌধুরীর চাকমা অনুত্তরা দেওয়ানের সাথে বিবাহকে উল্লেখ্য বলা যায়। সে থেকেই এই তিন রাজ সম্প্রদায়ে আত্মীয়তা রচনার অচলায়তন ভেঙ্গেছে এবং আজকাল ছোট-বড় নির্বিশেষে আন্ত-মঙ্গোলীয় আর অমঙ্গোলীয় সাম্প্রদায়িক মিশ্র বিবাহ প্রায় প্রচলিত। এই মিশ্র সামাজিকতার গুণে, মিশ্র প্রজন্মের উদ্ভব হচ্ছে। এতেই জন্ম নিচ্ছে নতুন এক সংকর মঙ্গোলীয় সমাজ। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এখন তারা কোন বিশুদ্ধ মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোলীয় আর মিশ্র জাতের লোকেরা পরস্পরকে রক্ত মাংসে গ্রহণ করছে। কারো মাঝেই এখন আর আদি শ্রেণীগত বিশুদ্ধতা রক্ষিত নেই। তবে অনুন্নত বিচ্ছিন্ন পার্বত্য বা বন্য উপজাতি সমাজের লোকজনই শ্রণীগত বিশুদ্ধতার পরিমাপে এখনো অধিক উত্তীর্ণ। গহীন অরণ্য আর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতে, সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জুমিয়া লোকজনই বিশুদ্ধ উপজাতীয় চরিত্র ধারণ করে আছে। টুটেম বিশ্বাস ও টাবুর মান্যতা তাদের মাঝেই পাওয়া সম্ভব এবং একমাত্র তারাই উপজাতি পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য। জাত্যাভিমানী সুসভ্যরা খাটি উপজাতি নয়। বিশেষতঃ রাজরক্তের দাবিদার চাকমা মগ ও ত্রিপুরারা, ইতিহাস খ্যাত সভ্য সমাজের লোক। এদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও আদিম উপজাতি হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

জাতি, উপজাতি আর অউপজাতি সংজ্ঞা।

এখানে জনৈক পন্ডিতের বক্তব্য প্রথমেই দ্রষ্টব্য

ক) উপজাতিদের আদিম সমাজের মানুষ হিসেবেই গণ্য করে গবেষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছি। (সূত্রঃ প্রফেসার পিয়ের বেসানেতঃ ট্রাইবস্‌ম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টসঃ মুখবন্ধ, শেষ প্যারা।)

খ) যদি আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজো যারা টিকে আছে তাদের বুঝায়, তবে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আধিবাসীদেরকে আদিম বলে বর্ণনা করা সত্যের অপলাপ হবে।ঃ (সূত্রঃ অধ্যাপক পিয়ের বেসানেত, ট্রাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাকট্‌স, প্রথম পরিচ্ছেদ প্রথম প্যারা।)

আমরা যাদের উপজাতি বলি, পাহাড়, সমতলবাসী সে চাকমা, মারমা, লুসাই, ত্রিপুরা কুকি খুমি ইত্যাদি ভিন্ন রং ও চেহারার লোকজন সম্পর্কে এখনো আমাদের মাঝে সীমাহীন অজ্ঞতা বিদ্যমান। যা জানি তাও নির্ভুল নয়। তাই সাধারণ অজ্ঞ মানুষতো বটেই, অনেক পন্ডিত আর নীতি নির্ধারকরা ও বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। একবারও আমরা তলিয়ে দেখিনা, তাদের উপজাতি আখ্যা কি সঠিক? তাদের পরিচয়সূচক কথা ও কাহিনীগুলো কি প্রকৃতই ইতিহাস? মাঝে মধ্যে পক্ষে বিপক্ষে উষ্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তার মীমাংসা হয় না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই ফেলে রাখারও অবকাশ নেই।

ভেবে দেখা অবশ্যই দরকার যে, যাদের আমরা উপজাতি বলি, তারা তত্ত্ব কথা বাদে আভিধানিক অর্থে কোন্ মূল জাতির উপজাতি বা শাখা জাতি কিনা? বৃটিশ আমল থেকে এ যাবৎ আমাদের তিনবার জাতীয়তার বদল হয়েছে, কিন্তু ওরা আগেও ছিল উপজাতি, আর এখনও তাই আছে। তাত্ত্বিক অর্থে উপজাতি হলে মানতে হবে এরা সভ্যতার আচার আচরণে অনব্যস্ত এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত পশ্চাদপদ আদিম লোক, যারা টুটেমে বিশ্বাস করে ও টাবু মানে। কিন্তু এরা আদতে তাও নয়। তবে এরা মানব শাখাভিত্তিক ক্ষুদ্র পাহাড়ী সংখ্যালঘু অর্থে উপজাতি মান্য।

কেবল শারীরিক রং গঠন ছাড়া এখানে বাংগালী অবাংগালীতে পারস্পরিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয়। পাহাড় ও সমতলের আবাস, ভাষার ভিন্নতা, আচার-আচরণের পৃথক স্বকীয়তা ইত্যাদি, জাতি আর উপজাতি হওয়ার সুত্র নয়। বাংগালীরা বাংলায় কথা বলে, অবাঙ্গালীদের অনেকের ভাষাও তাই। শুধু পার্থক্য হলো আঞ্চলিক কথন রীতিতে। একাধিক ভাষাভাষী একক জাতির অস্তিত্ব দুনিয়ায় ভুরি ভুরি। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান বাংগালীরা, আরবী ফার্সি, তুর্কি, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত ও লাটিনে নাম নাখে। চাকমা সমাজে তো বটেই, অন্যান্য সম্প্রদায়ে ও তার প্রচলন আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান বাংগালীরা যে ধর্মাদি পালন করে, তথাকথিত উপজাতীয় সমাজেও তাই পালিত হয়। উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো কতিপয় সংস্কার সংস্কৃতি রং ও চেহারায়। এটা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হওয়ার গ্রহণীয় কারণ নয়। বড় জোর তজ্জন্য পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করা যায়, যা তাদের আছে। সুতরাং বাংগালীদের মত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা লুসাই ইত্যাদি জনগোষ্ঠী পৃথক পৃথক সম্প্রদায় মাত্র, তাত্ত্বিক জাতি বা উজপাতি নয়। এরা সবাই মিলেই একক অভিন্ন বাংলাদেশী জাতিসত্তা । এই জাতিসত্তার শাখা অর্থে এরা উপজাতি আখ্যায়িত হতে পারে।

চাকমাসহ বিভিন্ন অবাংগালী সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশী জাতির শাখা অথবা ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী অর্থে উপজাতি বলে পরিচয় জ্ঞাপন করা হলে, তা মেনে নেয়া যায়। তবে শুধু শারীরিক রং ও গঠনের পার্থক্যের গুণে ঢালাওভাবে পারিভাষিক অর্থে তাদের উপজাতি বলা সঠিক নয়। মঙ্গোলীয় চেহারা আর শারীরিক গঠন, উপজাতি হওয়ার সুত্র নয়। সভ্যতার গুণাবলী সম্পন্ন কেউই তাত্ত্বিক উপজাতি নয়। আমাদের অবাংগালী সংখ্যা লঘুরা সভ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ পুর্ণ সভ্য লোক। তারা অনুন্নত হলেও আদিম নয়। তারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক নামে নতুবা শাব্দিক অর্থে বাংলাদেশী জাতির শাখা অথবা ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠী অর্থে উপজাতি আখ্যায়িত হতে পারে। তাত্ত্বিক পরিভাষাভুক্ত আদিম অসভ্য অর্থে তারা উপজাতি পদবাচ্য নয়। সভ্যতার বাহন ভাষার বিচারেও চাকমারা বাংলা ভাষাভাষী, যে ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক কথন রীতিতে, বাংগালীরা ও কথা বলে। ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও পূজাপার্বণ পালনে বাংগালী ও অবাঙ্গালী অভিন্ন। নামকরণ, আচার

অনুষ্ঠান ও লৌকিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংগালীদের সাথে তাদের তফাৎ কমই লক্ষ্যণীয়। সাজ পোশাকে সামান্য স্বকীয়তা থাকলেও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে তার ব্যবহার প্রায় সমান। উভয়ের মাঝে যে তফাতটি মৌলিক তা হলো পৃথক ভাষা রং ও গঠন। অদিকাংশ অবাঙ্গালী শারীরিক গঠনে, মিশ্র মঙ্গোলীয় আর বাংগালীরা আর্য্য-মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ী-সংকর। আন্তঃবিবাহজাত সংমিশ্রণের ফলে এখন অনেক ক্ষেত্রে, অবাঙ্গালীও বাংগালীতে তফাৎ প্রায় বিলীয়মান। পাহাড় ও সমতলের বসবাসে উভয়ই অভ্যস্ত ও পরস্পরের প্রতিবেশী। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন চর্চার প্রতিটি বিষয়ে উভয়ই সমান মানের অধিকারী। পশ্চাদপদতা আর আদিমতার কিছু অবশেষ উভয়ের মাঝেই বিদ্যমান। উপজাতিদের বিপরীতে স্থানীয় বাংগালীদের অউপজাতি বলাও ভুল। কোটি কোটি সংখ্যক বাংগালীর বিপরীতে অবাঙ্গালীরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। বাংলাদেশী বাংগালীদের সামগ্রিক সংখ্যায় তুলনায় সারাদেশবাসী অবাংগালীদের সংখ্যা ১% এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী অবাংগালীদের সংখ্যা তার অর্ধেক ভগ্নাংশ মাত্র। এই পার্বত্য বাঙ্গালীরা পৃথক সমাজ নয়। ক্ষুদ্র সংখ্যক জনগোষ্ঠীর সাথে বাংগালীরা তুলনীয় নয়। তাই তাদের বে-নামে উল্লেখ করা অযৌক্তিক। ক্ষুদ্র হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর পক্ষে বৃহৎ সম্প্রদায় বাংগালীদের মোকাবেলায় সামগ্রিকভাবে অবাংগালী আখ্যায়িত হওয়াই উচিত। ব্যাকরণের নিয়ম নীতিতেও বটে, উপজাতি শব্দের বিপরীত শব্দ অউপজাতি নয়। শব্দটি স্বরবর্ণে আরম্ভ হলে তার আগে 'অ' নয় অন যুক্ত হয়। তখন স্বরবর্ণ স্বরচিহ্নে রূপান্তরিত হবে এবং বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করবে। নেতিবাচক বিপরীত শব্দ গঠনের এটাই নিয়ম। এই নিয়মে উপকারীর বিপরীত শব্দ অনুপকারী, উপযোগীর বিপরীত শব্দ অনুপযোগী ইত্যাদি। সুতরাং উপজাতির বিপরীত শব্দে অউপজাতি বলা অশুদ্ধ এবং অপ্রাঞ্জল। বিজ্ঞান ও সংসদীয় আইনের ভাষায় অনুরূপ অনুপযোগী, সংজ্ঞার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। পন্ডিত সমাজের অনুরূপ গুরুতর ভুলকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। স্থানীয় পরিষদ আইনে এই ভুল সংজ্ঞাগুলোর ভুল ব্যবহার অত্যন্ত দুঃখজনক। পার্বত্য চুক্তি আর জেলা পরিষদ আইনে উপজাতি সংজ্ঞাটি গৃহীত। কিন্তু আজ কাল তাকে এড়িয়ে বিকল্প সংজ্ঞা আদিবাসী ব্যবহৃত হচ্ছে, যা বাহ্যতঃ স্ববিরোধীতা।

জুম জুমিয়া ও জুম্ম ল্যান্ড।

১৯০০ সালের রেজুলেশন নং ১ এর অধীন রচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫২ নং ধারাগুলোতে সর্দার, হেডম্যান, সার্কেল, মৌজা, পাহাড়ী, উপজাতি, আদিবাসী জুম ও জুমিয়া সংক্রান্ত আইন ও নীতি নির্দেশ বিধিবদ্ধ আছে। তার আগে জুম চাষ, জমি বন্দোবস্তি ও জুম প্রশাসনের পক্ষে কোন বিধিবদ্ধ আইন বা নীতি নির্দেশ চালু ছিলো না। তিন উপজাতীয় রাজার সর্দারী মর্যাদা, দায়-দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা, মৌজা প্রধান হেডম্যানদের নিযুক্তি, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা এবং জুমিয়াদের মানগত স্বীকৃতির

এটা প্রথম বিধিবদ্ধ সরকারী আইন। মোগল প্রশাসনের আওতায় জুম নোয়াবাদের নামে এক প্রকার অস্থায়ী বন্দোবস্তি প্রচলিত ছিলো বলে, সে আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কোন বিবরণে উল্লেখিত আছে। ঐ সুত্রে এতদাঞ্চলকে বলা হতো জুমবঙ্গ। তার বিকল্প নাম ছিল কাপাস মহাল। জুমিয়ারা নির্দিষ্ট পরিমান কর বা কার্পাস তুলা প্রদানের অঙ্গীকারে খাস পাহাড়াঞ্চলে জুম চাষ করতো। জুমিয়া পরিবারগুলোর পক্ষে তাদের সর্দারেরা অস্থায়ী ভিত্তিতে তজ্জন্য জিম্মাদার হতেন। এর ব্যতিক্রম হিসাবে অনেক সময় সরকারের পক্ষে জুমকর নগদে বা তুলার আকারে সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হতেন। মোগল আমলের ঐ জুম নোয়াবাদ ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার অক্ষুণ্ন রাখেন। প্রকৃতপক্ষে তা ভূমি স্বত্বহীন ভ্রাম্যমান আদিম চাষ ব্যবস্থা। আসলে এখনকার মত অতীতেও ভূমি স্বত্ব লাভের পক্ষে বন্দোবস্তি গ্রহণ জরুরী ছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশে চিরকালই মূলভূমি মালিক সরকার। বন্দোবস্তিহীন দখলীয় স্থায়ী মালিকানা ব্যবস্থা এদেশে কোনদিনই প্রচলিত ছিলো না।

জুমকর বা জুম খাজনা ভূমিরাজস্ব নয়। তা জুমিয়াদের পরিবার পিছু প্রদেয় কর মাত্র। তারা কোন জুম ভূমি নির্দিষ্ট আকারে স্থায়ীভাবে ভোগদখলও করে না। প্রতি জুম মৌসুমে নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বন্দোবস্তি বা স্থায়ী দখলের ভিত্তিতে কোনভাবেই তাদের ভূমি'ত্ব গড়ে ওঠেনি। আরাকানের রোসাং থেকে আগত চাকমা প্রধান শের মস্ত খাঁই উপজাতিদের মাঝে প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খাঁ কর্তৃক দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার কোদালা উপত্যকায় কিছু খাস পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তি ও পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুমকর সংগ্রহের তহসিলদারী লাভ করেন। এতদাঞ্চলে তদীয় পারিবারিক ও চাকমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার এটাই ভিত্তি। যেহেতু চাকমারা অভ্যাসগতভাবে জুম চাষী এবং অন্যান্য উপজাতিগুলোও তা-ই, সেহেতু সরকারী চেষ্টা ও সদিচ্ছা থাকা সত্বেও, তারা জমি বন্দোবস্তি গ্রহণ করে স্থায়ী চাষী ও ভূম্যাধিকারীতে পরিণত হয়নি। সর্দার ও হেডম্যানরাও জুমকরের ভাগ রক্ষায় পাহাড়ী প্রজাদের জুমিয়া করে রেখেছেন। তহসিলদারীর অর্থ জমিদারী নয়। জুম তহসিলদারীর সাথে ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত নয়।

জুমতন্ত্র নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির সীমানা মান্য করে চলে না। তার ক্ষেত্র হলো অবাধ আর অনিয়ন্ত্রিত বন পাহাড়ের অরাজক পরিবেশ। সীমান্ত আর জাতীয় বাধা নিষেধে তা আবদ্ধ নয়। নাগরিকত্বের বিধি নিষেধ পালনে জুমিয়ারা অনভ্যস্ত। জুমকে অনুসরন করে তারা সহজেই সীমান্ত পাড়ি দেয়। তারা মুখ্যতঃ সর্দার নিয়ন্ত্রিত লোক। তাদের উভয়ের সম্পর্ক রাজ্যহীন রাজা ও প্রজার।

প্রকৃত পক্ষে জুমিয়া জীবন বড় করুণ। আধুনিক জীবন চর্চার কিছুই তাতে নেই। অভাবী, অপগন্ড স্বাস্থ্যহীন, নিরক্ষর, ক্ষুৎপীপাসা কাতর ও যাযাবর এক শ্রেণীর

পাহাড়ী চাষী হলো জুমিয়ারা। বাংলাদেশের নদী-নালার নৌকাবাসী, এক শ্রেণীর লোক, যারা কোন জায়গা জমির মালিক নয়, সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখান, সিঙ্গা দেওয়া, চুড়ি পুঁতি ফেরী করে বিক্রি করা ইত্যাদি ইতর কাজের রোজগারে যারা নিত্য আনে নিত্য খায়, সেই যাযাবর শ্রেণীর বেদে সমাজের মত, দ্বিতীয় যাযাবর শ্রেণীর লোক হলো জুমিয়ারা। তফাৎ শুধু এই যে, জুমিয়ারা স্থলাশ্রয়ী কৃষিজীবী। জমি ভোগ করে বটে, তবে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক হয় না, এবং বেদেরা জলাশ্রয়ী ফেরীওয়ালা। তাদেরও কোন জমি নেই।

নিরিবিলি নির্জন পাহাড় চূড়ায় বা ঢালে, বিচ্ছিন্ন একটি ছোট্ট মাচাঘর, যা বাঁশ বেত ও ছনের তৈরী, তাতে স্বামী-স্ত্রী বাদে দু'চারটি নাবালক ছেলে-মেয়ে, দু'একটি মোরগ-মুরগী ও কখনো একটি কুকুর সঙ্গী মাত্র থাকে। গৃহস্থালী সাজ সরঞ্জাম বলতে দু'চারটি এলোমনিয়ামের হাড়ি পাতিল ও থালা, মাটির কলসী গজি ও কত্তি নামীয় চুরাই, দু'চারখানা শীত নিবারনী মোটা কাপড় ও চাদর, এসবই স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ঝুড়িতে এক যাত্রায় বহনযোগ্য। পরিধান হিসাবে পুরুষের নেংটি বা গামছা ও ফতুয়া, আর স্ত্রী লোকের নিম্নাঙ্গে পেচিয়ে পরার যোগ্য পিনন বা লুঙ্গি, ফতুয়া বা ব্লাউজ, বুক কাপড় ও পাগড়ি এবং স্বচ্ছলদের অলংকার হিসাবে পুঁতির মালা রুপার খাড় , হাচুলী ও বাজুবন্দ ইদ্যাতি। ছেলে-মেয়েরা তো অধিকাংশ নেংটাই থাকে। খাবার হিসাবে জুমে উৎপন্ন চাল তরিতরকারী এবং জংলী শাক-সবজি ও আলু, যার সাথে কদাকিত যুক্ত হয় সুটকি বা নাপ্পি, যা বহু চড়াই উৎরাই, হাটা ও নৌ যাত্রার মাধ্যমে দুরবর্তী বাজার থেকে সংগৃহীত হয়। মাছ মাংস এদের ভাগ্যে খুব কমই জুটে। উৎসব আনন্দ, শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশ থেকে মুক্ত জংলী জীবন। রাত ঘনাবার আগেই খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে, গল্প গুজব গুণগুনাণী ও ঘুমিয়ে পড়া। কদাচিত দুরবর্তী জুমবাসী কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধা বা যুবক-যুবতীর সাথে দেখা হয়। সারা দিনরাত পোকা মশা আর জোঁকের উৎপাত। অভাবে অসুবিধায় বনের গাছ বাঁশ লতাপাড়া সংগ্রহ আর বিক্রি এবং জংলী লতাপাতা ও আলু ভক্ষণ, এই হলো জুমিয়া জীবন।

জমির মালিকানা জন্ম মাটির সাথে নাগরিকদের প্রেমাবদ্ধ করে। জুম ব্যবস্থায় সে সুযোগ অনুপস্থিত। নির্দিষ্ট একখন্ড ভূমির মালিকানা ছাড়া নাগরিক দায়িত্ববোধ ও অধিকার গড়ে ওঠে না। বসবাসের স্থায়িত্ব, ভূমি মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। এটা ছাড়া স্থানীয় বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী অবান্তর।

জুম ব্যবস্থা প্রকৃতি ও পরিবেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক তো বটেই, জুমিয়ারা ও তাতে যাযাবর জীবন-যাপনে বাধ্য থাকে। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, উন্নত আসবাব, আবাসন, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলো গহীন বন ও দুর্গম পাহাড়ের জুমে নাগালাধীন ও সহগামী হয় না। ফলে জুমিয়ারা অশিক্ষিত অভাবী বন্য ও ক্ষুৎসীপাসা-কাতর থাকে। জুম ব্যবস্থাও জুমিয়া পরিচিতি,

আদিমতায় আবদ্ধ। তাতে গর্বিত হওয়ার কিছুই নেই। কিছু অপরিহার্য মোটা কাপড় আর বাঁশ বেতের সাধারণ ঝুড়ি ব্যতীত, যাবতীয় শিল্প কর্মে তাদের আজও অজ্ঞ থাকার এটাই প্রধান কারণ। জুমিয়া জীবনের অপরিহার্য্য প্রধান অস্ত্র দা ও কুড়াল এবং গৃহস্থালী হাড়ি পাতিলের জন্য পর্যন্ত তারা পরনির্ভর। অবশ্য তাদের আড়ম্বর হীন ও মুক্ত জীবনধারায় এক ধরনের আকর্ষণ ও মোহ থাকা স্বাভাবিক। যে আধুনিকরা গর্বের সাথে নিজেদের জুমিয়া পরিচয় দেন, প্রকৃতপক্ষে জুম করা ও জুমিয়া হওয়া তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। এটা তাদের অতীত ঐতিহ্য হলেও, আধুনিক পরিচয়ের সুত্র হওয়ার অযোগ্য। উন্নত জীবন ও আধুনিক চাহিদা জুমের দ্বারা পূরণ সম্ভব নয়। এটা এক আদিম অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। সেহেতু জুমিয়া পরিচয় যুগোপযোগী নয়।

আজকাল তথাকথিত উপজাতিদের উচ্চাভিলাষী কেউ কেউ নিজেদেরকে জুমিয়া জাতি বা জুম্মজাতি আখ্যায় ভূষিত করছেন। পাহাড় জংগলের অধিবাসী সমাজে প্রচলিত জুম পেশা আজকাল প্রায় বিলীয়মান। এটা গৌরবজনক পরিচয় সুত্র নয়। তদুপরি কোন একক স্বাধীন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিত্বের সহাবস্তান অসম্ভব।

সুতরাং বাংলাদেশে জুমিয়া জাতিত্বের চর্চা ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান, একক জাতিত্ব ও দেশপ্রেমের পরিপন্থী। প্রাকৃতিক বিচারেও জুম অত্যন্ত ক্ষতিকর পেশা। পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সবুজ আচ্ছাদন তদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বন্য পশুপাখী তদ্বারা আশ্রয়হীন ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বনজ সম্পদ দায়ের কুপ কুঠারাঘাত ও আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। মাটিতে ক্ষয় ধরে ও তার উর্বরতা হ্রাস পায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রয়োজনীয় ভারসাম্যতা হারিয়ে জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বনের অভাবে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। উর্বর জুম ভূমির আকর্ষণে যাযাবর জুমিয়ারা অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম অরক্ষিত সীমান্তের দুধারে পারাপার করে, যদ্দরুণ তারা হয়ে পড়ে দেশহীন বা দেশ মুক্ত নাগরিক। স্বদেশে বিদেশে কথাও তাদের জুমিয়া জীবন ও জুমের পেশা স্থিতিশীল হয় না। ভূমি বন্দোবস্তি ও মালিকানা জুম ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয়। খাস পাহাড়ী বনাঞ্চলই তার অবাধ চর্চা ক্ষেত্র। ১৮৭৫ খৃঃ সাল পর্যন্ত এতদাঞ্চলের ভূমি রাজস্ব খাতে কোন খাজনা উশোলের উল্লেখ নেই। এর অর্থ তখনো এতদাঞ্চলের কারোরই ভূমি মালিকানা ছিলো না। জুমকর ভূমি রাজস্ব নয়। তা মূলতঃ ক্যাপিটেশন টেক্স যা জুমিয়া পরিবার পিছু ধার্য্যকৃত কর, যা এতদাঞ্চলের উপজাতিদের উপর প্রযোজ্য। বন্দোবস্তির দ্বারা ভূমি মালিকানা বা স্বত্ব লাভের ব্যবস্থা অতীতে এতদাঞ্চলে বিরল ছিলো। তখনো হাল কৃষিতে জুমিয়া সমাজ অভ্যস্ত হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে জুম চাষ ও স্থানান্তর গ্রহণ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা হিসাবে, হেডম্যান বা মৌজা প্রধান কর্তৃক ভূমি দখল দান, প্রথম তিন বছরের জন্য খাজনা রেয়াত, সহজে কৃষি ঋণ প্রদান, বাঙ্গালীদের দ্বারা জমি আবাদকরণ ও কৃষি প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি সরকারী উদ্যোগ গৃহীত হয়। ফলে জুমিয়া ও অভিজাতদের অনেকে ভূমি বন্দোবস্তি ও হাল

কৃষি গ্রহণ করেন। তবুও জুম পেশার উচ্ছেদ হয়নি। জুমকরের বৃহদাংশ এবং কিছু বাড়তি পাওনার লোভে রাজা ও হ্যাডম্যানদের উৎসাহে আর স্বার্থেই তা চর্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

জুম পেশা ও জুমিয়া হওয়ার মাঝেই কার্যতঃ এই সমাজের ভূমি মালিকানা ও আদিবাস অস্বীকৃত। পার্বত্য অবাঙ্গালীরা সংখ্যায় কম হলেও বাংলাদেশ তাদের জন্ম ভূমি। ভূমি মালিকানা ও জন্ম সুত্রেই বাংগালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের আদিবাসিন্দা ভূমি সন্তান এরা বহির্দেশীয় লোক নয়। চাকমা, মগ, খিয়াং, খুমি ইত্যাদি সংখ্যালঘুরা নিজেদের কথা কাহিনীতেই বিদেশাগত বলে স্বীকৃত। রাজারা মূলতঃ একেক দল সংখ্যালঘু জুমিয়ার দলপতি। তাঁরা কোন রাজ্যের অধিপতি বা জমিদার নন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারাই তারা রাজা খেতাবে সম্বোধিত। সরকারের কাছে তারা জুমকর সরবরাহকার। এরা জুম তহসিলদারীর পারিশ্রমিক হিসাবে মাসোহারাভোগী ও তদোতিরিক্ত জুম করের ভাগীদার ও বটে। জমির মালিকানার জন্য বন্দোবস্তি লাভ, দীর্ঘ অবলম্বিত ঐতিহ্য। খোদ আদি রাজা শের মস্ত খাঁকেও কোদালার মাওদায় জমি বন্দোবস্তি নিয়ে এদেশে বসবাস শুরু করতে হয়েছিলো। এই অনুসরণীয় বন্দোবস্তি প্রথাকে অবজ্ঞা করে শুধু দখলের দ্বারা জায়গা জমির মালিক হওয়ার উপজাতীয় প্রক্রিয়া ভুল। এই ভুলের মাশুল অবশ্যই দিতে হবে। জমি খাস রেখে মালিক হওয়ার উপজাতীয় প্রক্রিয়া ভুল। বাঙ্গালীরা সরকার প্রদত্তচিহ্নিত খাস জমির বন্দোবস্তি প্রাপ্ত খাটি বৈধ মালিক। তাদের অধিকার আইনতঃ চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়। আর গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয়দের লাখেরাজ সম্পত্তিও ভাবা অনুচিত। বিদেশী মদদ আর অস্ত্রের শক্তি মত্তায় ন্যায়-অন্যায় ভুলে যাওয়া যুক্তির কথা নয়। বাঙ্গালী বিতারণে বেশি উৎসাহ প্রদর্শনকে সন্দিগ্ধ বাঙ্গালী পক্ষ ভুল বুঝতে পারে। এই ভুল বুঝাবুঝি, আর এক তরফা আত্ম-স্বার্থ-চিন্তা, পরিহার করা ছাড়া, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরে আত্মতুষ্টি লাভ সম্ভব হলেও, তার কোন সুদূর প্রসারী সুফল আশা করা যায় না। লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে ও বন্দোবস্তি থাকা জরুরী হয়। সম্প্রদায় ও ধর্ম বিদ্বেষকে আলোচনার উপজীব্য করা ঠিক নয়। মাননীয় রাজা বাবু উল্লেখিত সেমিনারের প্রবন্ধে পবিত্র ধর্মকেও টেনে এনে বাঙ্গালী ইসলাম, ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই তার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। আপনার বক্তব্যটি যথা ঃ

Almost all the recent migrants to the C.H. Ts are ethnically Bengali and largely of Islamic faith. The vast majority of hill people are Budhist, followed by Hindus and Christians.

বাংলা ঃ মানবগোষ্ঠী গত বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত সাম্প্রতিক কালের উদ্বাস্তুদের প্রায় সবাই বাঙ্গালী, যাদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। পাহাড়ী উপজাতিদের গরিষ্ঠতম অংশ বৌদ্ধ, তৎপর হিন্দু ও খ্রীষ্টান (সুত্র ঐ)

এখন প্রথমে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক পরিচয় সন্ধানই প্রয়োজন। এরা কি পৃথক দুই নৃগোষ্ঠী? ভাষা সংস্কার সংস্কৃতি, সাজ পোষাক, আচার আয়োজন ও দৈহিক রং গঠনে চাকমা ও বাঙ্গালীতে পার্থক্য অতি ক্ষীণ। কেবল লৌকিকতা ও পরিবেশ পরিস্থিতিগত ভিন্নতা ব্যতীত, এ দুয়সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন। বোচা গঠন, গোরা রং, আর পাহাড়ের অধিবাস বনাম ধার গঠন শ্যামলা রং আর সমতলের অধিবাস, নৃতাত্বিক পৃথক পরিচয়ের সুত্র নয়। এই পার্থক্য কারো পক্ষে একচেটিয়াও নয়। বাঙ্গালীদের বিপুল সংখ্যক লোক মঙ্গোলীয় রং ও গঠনের অধিকারী। চাকমা সমাজেও আর্য্য দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণজাত তীক্ষ্ণ শ্যামলা রং গঠনের লোক, সংখ্যায় কম নয়। পেশাগত জুম ঐতিহ্যই চাকমাদের পাহাড়বাসী, আর বাঙ্গালীদের হাল চাষ ঐতিহ্যই সমতলবাসী করেছে। তবু লাঙ্গল চাষীতে পরিবর্তিত হয়ে অনেক চাকমা আজকাল পাহাড়ের উপত্যকাময় সমতলের বাসিন্দায় পরিণত ও বাঙ্গালীর সম পরিবেশ গত অবস্থানে উপনীত হয়ে গেছেন। একই ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি আচার ব্যবহার অবস্থান ও রং গঠন ধারণ করে চাকমারা এখন বাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক নৈকট্য সম্পন্ন বর্ন বা গোষ্ঠী। একই সাথে তারা অন্যান্য প্রতিবেশী উপজাতীয়দের তুলনায় অধিক বঙ্গীয় পরিচয় সম্পন্ন। অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায় যেমন তাদের অবঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার আচার ঐতিহ্য আর রূপ গঠনের গুণে পরিস্কার অবাঙ্গালী, তদ্রুপ চাকমারা অধিক পরিমানে বঙ্গীয় ঐতিহ্য ধারী। চাকমা অভিজাতরা অতীত কাল থেকে এখনো বাঙ্গালী আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। তাদের অনুকরণে সাধারণ চাকমারা ও বাঙ্গালী আত্মীয়তা থেকে মুক্ত নন। আদি রাজা শের মস্ত খাঁসহ পরবর্তী দশজন চাকমা রাজা ও রাণীর নাম ও তাদের সীল মোহরগুলো প্রমাণ করে, তারা বাঙ্গালী অভিজাত মুসলিশ সমাজ ও তাদের ধর্মের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত নন যথা ঃ

১. আদি চাকমা রাজা ঃ শের স্ত খা ১৭৩৭ খ্রীঃ

২. রাণী সোনাবি ১৭৪০ খ্রীঃ

৩. রাজা শের জব্বার খাঁ ১৭৪৯ খ্রীঃ

৪. রাজা নুরুল্লাহ খাঁ ১৭৬৫ খ্রীঃ

৫. রাজা ফতেহ খাঁ ১৭৭১ খ্রীঃ

৬. রাজা শের দৌলত খাঁ ১৭৭৩ খ্রীঃ

৭. রাজা জান বখশ খাঁ ১৭৮৩ খ্রীঃ

৮. রাজা তব্বার খাঁ১৮০০ খ্রীঃ

৯. রাজা জব্বার খাঁ ১৮০১ খ্রীঃ

১০. রাজা ধরম বখশ খাঁ ১৮১২ খ্রীঃ

রাজা ধরম বখশ খাঁর বিধবা পত্নী রাণী কালিন্দি স্বীয় নামের শেষে মুসলিম ঐতিহ্যযুক্ত বিবি উপাধি আমৃত্যু ব্যবহার করেছেন। এই রাজপরিবারের সমাজ ছিলো রাঙ্গুনিয়ার মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত। রাজানগরের পরিত্যক্ত ঐ রাজ বাড়ীর দীঘির পাড়ে এখনো তখনকার রাজকীয় কবরস্থান ও মসজিদ বিদ্যমান আছে। পড়োমান রাজ প্রাসাদটি এখনো মোগল স্থাপত্য শিল্পের নির্দেশন হিসাবে দন্ডায়মান রয়েছে। অদ্যাবধি রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে মুঘলাই সাজে সজ্জিত হয়ে চাকমা রাজা, স্বীয় প্রজাদের কুর্নিশ খাজনা ও নজরানা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণ চাকমা প্রজারা এখনো তাদের হুজুর ও বিবি সম্বোধন করে।

এখানে স্মর্তব্য যে, আমি রাজাদের যে তালিকা ও তাদের কার্য্যকাল সাজিয়েছি তার ভিত্তি হলো ঃ কতিপয় রাজকীয় সীল মোহর। এর সাথে অধ্যাপক এ এম সিরাজ উদ্দিন রচিত রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস প্রবন্ধ ও সরকারী দলিল পত্র। রাজা ভুবন মোহন রায়কৃত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস ও অন্যান্য কতিপয় লেখকের বর্ণনার কিছু অমিল আছে।`

রাজা ধরম বখশ খাঁর নাতি রাজা হরিশচন্দ্র রায় থেকেই মুসলিম নাম ও খেতাবের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত। ১৯৭২ খ্রীঃ সালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষই তাকে রায় উপাধি প্রদান করেন। তৎপুর্বে তদীয় পিতৃপক্ষের দ্বিতীয় উর্ধপুরুষ অর্থাৎ দাদা মাল্লাল খা পর্যন্ত মুসলিম নাম খেতাবের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিলো। পিতা গোপীনাথ থেকেই অমুসলিম নাম করণের শুরু। মা রাজা ধরম বখশ খাঁ কন্যা চিকন বিবি পর্যন্ত বিবি উপাধি অনুসৃত হয়েছে। এই মুসলিম ঐতিহ্য হলো তাদের প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক।

অপর দিকে সাধারণ চাকমা ভাষা ও নামকরণে মুসলিম ঐতিহ্য অনুসৃত হওয়ার প্রমাণ হলো সৃষ্টিকর্তাকে খোদা সম্বোধন, সময়কে ওক্ত বলা, বউ ছাড়াকে তালাক আখ্যা দান, অভিবাদনকে সালাম বলা, ইত্যাদিসহ তান্যাবি, ধন্যা বি, জুম্যা বি, চেঙ্গীজ খাঁ, বাঙ্গাল্যা ইত্যাদি নাম করণ। এটা চাকমাদের অনস্বীকার্য মুসলিম ধারা ঐতিহ্য। এই ঘোর উপজাতীয় ঐতিহ্য প্রীতির যুগেও বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা রচনার প্রবণতা তাদের মাঝে অব্যাহত আছে। খোদ রাজা বাবু, রাণী বিনীতা রায়ের নাতি, যিনি একজন বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা। তদীয় অপর পক্ষীয় পিতৃব্যরা ও হিন্দু মহিলা সুধীরা রায়ের গর্ভজাত সন্তান। সুতরাং জাত ও ব্যক্তিগত অহমিকা দেখাবার মত সঠিক ভিন্নতা চাকমাদের নেই। তারা বড়জোর বাঙ্গালী সংকর মঙ্গোলীয় শাখা। ভেবে দেখা উচিত, বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও প্রত্যাবাসন, কোন সরকারী আদেশ নিষেধের দ্বারা কার্যকর করা কখনো সম্ভব নয়। কোটি কোটি বেকার ও ভূমিহীন বাঙ্গালীর জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা ও এতদাঞ্চলকে একমাত্র উপজাতীয় অঞ্চল রূপে সংরক্ষিত রাখা, বাস্তবে নয় কল্পনায়ই সম্ভব। বাস্তব হলো উভয়কে সহ অবস্থান করতে হবে।   পক্ষপাতিত্ব, উস্কানী, আর বাড়াবাড়িতে এ পর্যন্ত ক্ষতি ছাড়া উপকার হয়নি। এ পথ পরিত্যজ্য। শান্তি স্থাপনে 'অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ সমাজপতিদেরই বেশী। এই সম্ভাব্য শান্তি আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি হবে এতদাঞ্চল, আর ভুক্তভোগী জন সাধারণকেই হতে হবে তার সমর্থক

পক্ষ। তবে সমাজ মান্য ব্যক্তিদেরই নিতে হবে এর নেতৃত্ব। ঐতিহ্যগতভাবে উপজাতীয় রাজপুরুষদের সে সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতা আছে। তাই রাজা বাবুর পক্ষে সংকীর্ণ উপজাতীয় মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ বাঞ্ছিত নয়। বাঙ্গালীরা সম্ভাব্য নিরপেক্ষ শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তবে তার লক্ষ্য হতে হবে, শান্তি, সহাবস্থান ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যে রাজা বাবুর প্রতিপাদ্য হলো ঃ পুনর্বাসিত বাঙ্গালীরা অভিবাসী আর তারা উপজাতীয় লোকদের জায়গা জমির জবর দখলকার। বক্তব্যটি তথ্য নির্ভর নয়, পক্ষপাতদৃষ্ট। বন্দোবস্তি ছাড়া জায়গা জমির স্বত্ব অনন্তকাল স্বীকার্য্য নয়। বিদেশের মাটিতে পুনর্বাসন গ্রহণকেই অভিবাসন বলে। মূল ইংলিশ শব্দ ইমিগ্রেশনের এটি বাংলা প্রতিশব্দ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের আবাসন গ্রহণকে অভিবাসন বলা যায় না। এটি তাদের স্বদেশের ভিতর স্থানান্তর মাত্র। বরং উপজাতিদের বলা যায় অভিবাসী। তাদের মূল পিতৃ ভূমি সীমান্তের বিপরীতে বিদেশে অবস্থিত। রাজা বাবুর নিজ উর্ধ পুরুষ রাজা ভুবন মোহন রায়ের লিখিত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস পাঠে, ও চাকমা লোক কাহিনী শ্রবণের মাধ্যমেও অবগত হওয়া যায়, তাদের মূল পিতৃভূমি অজ্ঞাত এক চম্পক নগর। বাংলাদেশে আগমনের আগে তাদের আবাস স্থল ছিলো আরাকান। দ্বিতীয় প্রধান উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ত্রিপুরাগণ ও সন্দেহাতীতভাবে সাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী মগেরাও আরাকান বাসী। এখানে অন্যান্যের কথা উল্লেখ যোগ্যই নয়। এই বহিরাগত লোকজনকে ভৌমিক অধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের অভিবাসন নামীয় ৫২ ধারাধীন আইনটি জারি করা হয়েছিলো। এটিকে বাঙ্গালীদের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন বলা ভুল। এরা অভিবাসী নয়। উপজাতীয়দের চেয়ে অধিক অনুন্নত পশ্চাদপদ বাঙ্গালী নামধেয় কোটি কোটি অপগন্ড মানুষ এদেশেরই বাসিন্দা হয়ে আছে। অধিকন্তু উপজাতীয় আখ্যাটিও অযৌক্তিক। প্রতিবেশী দেশ সমূহে তাদের জাত ভাইরা উপজাতি বা আদিবাসী আখ্যায়িত নন। বার্মায় মগ বা মার্মারা মূল ঐতিহাসিক জাতি। সাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের মূল বাসিন্দারা ও ত্রিপুরা নামীয় জাতি। চাকমারা ও নিঃসন্দেহে এক অগ্রসর সুসভ্য সম্প্রদায়। আদিম জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। এই লোকদের অসভ্য অনুন্নত আদিমতার আচ্ছাদনে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা বেদনা দায়ক। তাদের দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্য গোটা জাতীয় অবস্থারই প্রতিচ্ছবি, পৃথক কিছু নয়।

চাকমা আভিজাত্যের রহস্য।

চাকমা পন্ডিতদের লিখিত পুঁথি পুস্তক আর লোক সাহিত্যের বর্ণনায় তাদের যে কৌলিন্যের উল্লেখ আছে, যুক্তির মূল্যায়নে তার কোন স্বীকৃতি মিলে না। তারা নিজেদের জুম সংস্কৃতির অধিকারী বলেও দাবী করেন। অথচ উক্ত পেশায় উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন স্বীকৃত নয়। স্বভাবতই এ পেশার অনুসারীদের স্থায়ী পাড়া বা নগর জীবন থেকে দূরে দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চলে থাকতেও প্রতিবছর স্থানান্তিরত হতে হয়। অনুরূপ যাযাবর জীবনে শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা সহ সুন্দর ও সুস্থ জীবন-যাপনের উপকরণ ও পরিবেশ থাকে না। তাদের আদিম অনুন্নত জীবন-যাপনের স্বীকৃতি মিলে রাজা বিজয় গিরির বিখ্যাত ঐ উক্তিতে, যথাঃ

লোকগীতির ভাষ্য ঃ	=	বাংলা ভাষ্যঃ
পরুয়া পন্দিত নেই যে দেজৎ	=	পড়ুয়া পন্ডিত নেই যে দেশে
যেতুং নয় সৈন্যগণ সেই দেজৎ।	=	যাবোনা সৈন্যগণ সেই দেশে।

বর্ণনা অনুযায়ী বিখ্যাত নায়ক ও নায়িকা রাধা মোহন ও ধনপতির মা দুজনই সহোদরা বোন, বা জ্ঞাতি বোন বা বান্ধবী।

রাজ পরিবার বা সামন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের গর্বিত সদস্য তারা। অথচ তাদেরকে এবং তাদের ছেলে-মেয়েকে অতি অনুন্নত আদিম জীবন-যাপন করতে হয়, যথা ঃ

লোকগীতির ভাষ্য ঃ	=	বাংলা ভাষ্য ঃ
(ক) পূব বেলান পজিমে গেল,	=	পূর্বের বেলা পশ্চিমে গেল,
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক,	=	কাটা ডালপালা বেঁধে নিলে,
মেনকা কবুদি দ্বিবোন,	=	মেনকা কপোতি দু'জনে বোন,
রান্যাত্তোন লর দিলাক,	=	জুম ভূমি থেকে হাটা দিলে,
(খ) লুই য়ে মাচ্ছুন তগাদন,	=	ঝাকিতে তারা মাছ খুঁজে,
মাদি বেগুনি ছাগদন!	=	মাটি সারাটি ছেকে নেয়,
ধিমা তিতা উগুরাদন!	=	ধিমা তিতা তুলে আনে!
কাত্তোল ধিঙি তগাদন !	=	কাঁঠাল ঢেঁকি খুঁজে নেয়,
বাতবাত্যা সাগ ভাঙ্গদন!	=	বাটবাটি শাক ভেঙ্গে লয়!
কাবি কুচ্যাল পেরাদন !	=	কুশ্যাল কেটে রস চিপোয়!
(সূত্র ঃ রাধা মোহন ধনপতি পালা)		(সূত্র ঃ রাধা-মোহন ধনপতি পালা)

উপরোক্ত উদ্বৃতির মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যে, তারা অতি সাধারণ মানুষ, যারা নির্দ্বিধায় জুম চাষ করে, লাকড়ি কাটে, জঙ্গল থেকে তরকারি হিসাবে শাক পাত তুলে, ও ছড়ায় ঝাকি দিয়ে মাছ ছেকে ধরে।

রাজ পরিবারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, তাদের এতদাঞ্চলের অন্যতম রাজা

ধাবানা, মাতামুহুরী নদী উপত্যকার তৈন ছড়ির মুখে স্থাপিত বাঁশ বেতের সিংহাসনে আসীন হয়ে ছিলেন, যা জৌলুসপূর্ণ কোন আয়োজন নয়। এমনি ভাবে রাজ পরিবারের অনেক সদস্যের নাম পদবী অর্থহীন ও তুচ্ছ শব্দের সমষ্টি। আভিজাত্যের উপযোগী উন্নত ও মূল্যবান আসবাব, উপকরণ, জৌলুশ, অলংকার, আড়ম্বর ও প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘর তাদের অধিকারে অনুপস্থিত। জুমিয়া বলতে আমাদের মানস চোখে ভেসে ওঠে এক অনুন্নত আর্ত মানুষের ছবি, যে দুর্গম পাহাড় ও বনের ছন বাঁশের তৈরী টং বাসী। তার পরনে এক খানা নেংটি বা গামছা। শরীর প্রায় উদোম বা ঘরে তৈরী নিমায় ঢাকা। মাথায় পাগড়ি পেচানো। ঘরে আসবাব বলতে কিছুর আয়োজন নেই। হাতে দা এবং পিঠে বাঁশ বেতের বোনা একটি ঝুঁড়ি। মেয়েদের ব্যবহার্য্য অলংকার হলো রূপার তৈরী খাড় হাচুলী পুঁতির মালা, এবং সাধারণ কাপড়। তারা নোংরা অপরিচ্ছন্ন, দুর্গম ও নির্জন পরিবেশবাসী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংযোগ বর্জিত এই আদিম জীবনে উন্নত জীবন চর্চার কথা চিন্তাও করা যায় না। এটা প্রমাণ করছে যে, জুম সংস্কৃতি চাকমা সমাজের পক্ষে উন্নত অতীত ও রাজা উজির হওয়ার দাবী প্রকৃতই গালগল্প। তবে তাদের নিকটবর্তী অতীতের এতদাঞ্চলীয় আভিজাত্য ও কৌলিন্য সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্য, যা অংশতঃ মুঘল ও কিছুটা বৃটিশদের দ্বারা রচিত। মুঘল আমলে তাদের সাথে সম্ভবতঃ মুসলমান সৈনিক ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের রক্তের সংমিশ্রন ঘটে, ও কিছু আত্মীয়তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই তারা আনুকূল্যের ছোয়া ও পায়। সে যুগের চাকমা রাজ পরিবারের প্রধানগণের সীলমোহর ব্যবহারের নমুনা প্রমাণ করে যে, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের কিছু সামন্তীয় আধিপত্য ছিলো। প্রকৃতই রাজা হলে তাদের প্রবর্তিত মুদ্রা পাওয়া যেতো এবং কিছু হলেও তা রাজ পরিবারের সংগ্রহে থাকতো। অতীত ঐতিহ্যের গৌরবজনক অধিকার, অতি মূল্যবান বলে খান্দানী লোকজনের তা সংরক্ষণ করার নজির সর্বত্রই আছে। চাকমা অভিজাত শ্রেণী ও তাদের অতীত ইতিহাসকে ধরে রেখেছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সীল মোহরের মত মুসলিম বাদশাহী বা সুলতানী আমলের, উল্লেখযোগ্য নির্দশন ও প্রমাণাদি থাকলে, তা তাদের গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক ও অনুকূল হতো। রাজাদের মুগলাই নাম উপাধি বৃটিশ আমলের মধ্যাংশে লোপ পেলেও, অদ্যাবধি, মুঘলদের দরবারী সাজপোষাক ও আড়ম্বর তাদের মাঝে অনুসৃত হয়। এবং এটাই তাদের সর্বাধিক প্রাচীন ও মূল্যবান অতীত আভিজাত্যের প্রতীক। তাদের কালজয়ী আভিজাত্যের দ্বিতীয় উদাহরণ হলো বৃটিশদের দ্বারা প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক সর্দারী পদবী। অতীতকে বাহুল্য বলে ফেলে দিলেও, এ দুটি মর্যাদার সুত্র, তাদের গৌরবের পক্ষে যথেষ্ঠ।

নৃতাত্বিক বিচারে চাকমাদের মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত ভাবা যায়। তবে তারা যে বিশুদ্ধ বা আদত মঙ্গোলীয় নয়, আর্য্য দ্রাবিড় আর মঙ্গোলীয় সংমিশ্রন জাত সংকর, তা তাদের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কার, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শারীরিক রং গঠনের বৈচিত্র্যেই ধরা পড়ে।

খৃষ্টাব্দ প্রথম শতক থেকে ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভাবিত ছিলো। অনেক ভারতীয় তখন উক্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে নতুন সভ্যতায় উদ্ভব হয়, তা অদ্যাবধি উক্ত অঞ্চলে স্বকীয় পরিচয়ে বিদ্যমান আছে। থাই রাজ পরিবার সহ সাধারণ মানুষ এখনো সংস্কৃত নাম ধারণ করে থাকেন। ইন্দোনেশীয় যাত্রীবাহী বিমান সংস্কৃত গরুড় নামে পরিচিত। বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে উল্লেখিত নিম্নোক্ত বিবরণটিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের অন্যতম দলিল, যথা ঃ 'এক সময় জনৈক চম্পা রাজকুমার বহু অনুচর বর্গ সহ সমুদ্র পথে, তাম্রলিপ্ত হয়ে ব্রহ্মদেশ গমন করেছিলেন।' (চাকমা সংস্কৃতির আদি রূপ, পৃঃ ৫৫)
সুতরাং চাকমারাও সে দলের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন ভারতীয় লোক হতে পারেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, চম্পা ভারতের বিহার প্রদেশভুক্ত একটি এলাকা, এবং বিহার বাংলা ও নেপালের সীমান্ত সংলগ্ন ত্রিভুজেও এ নামের আরেকটি স্থানের উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ নামটির সাথে তাম্রলিপ্ত এবং সমুদ্র যুক্ত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ভাবা যায় যে, সম্ভবত চম্পাই চাকমা উপখ্যান খ্যাত চম্পক নগর এবং তার ব্রহ্মদেশ অভিযাত্রী রাজকুমারই রাজা বিজয়গিরি। সুতরাং এ সুত্রে চাকম সমাজ মূলতঃ ভারতবাসী। তাই তাদের ভাষা, আচার, আচরণ, নাম করণ ও ধর্মী বিশ্বাসে ভারতীয় প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক, এবং কার্যতঃ তাই আছে।

চম্পক নগরকে প্রাচীন ভারতীয় এলাকা এবং বিজয়গিরি ও তাঁর সঙ্গী সাথীদে ভারতীয় লোক জ্ঞান করা সঙ্গত হলে, তথাকার লোক বলে তারা হয় ভারতীয় মিশ্র মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত হবেন। পরে দীর্ঘ আরাকান প্রবাসে তথাকার মঙ্গোলীয়দের সাথে রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটায়, তাদের পক্ষে পরিপূর্ণ মঙ্গোলীয় রূপধারণ সম্ভব হয়েছে।

আরব, ইরানের ধর্ম প্রচারক বণিক স্মপ্রদায় যাদের বিদেশে সম্মানার্থে শেখ সম্বোধন করা হয়, এবং বাণিজ্য উপলক্ষ্যে যাদের অনেককে চট্টগ্রাম ও আরাকানের সাগর উপকূলে বসবাস করতে হয়েছে, এবং এতদ্দেশীয় অনেক বাঙ্গালী পাঠান ও মোগল, যারা ব্যবসা ও রাজনৈতিক কারণে আরাকান অঞ্চলে প্রবাসী হয়েছিলেন, তাদের সবার স্থানীয় স্ত্রীদের গর্ভজাত মানবগোষ্ঠী, মাতৃ আকৃতি লাভের দ্বারা মঙ্গোলীয় রূপ লাভ করে থাকবেন। অনেকের মতে তারা হলেন তথাককার থেক বা সেক, যারা জের বাদী ও রোহিঙ্গা খ্যাত লোক। ওদের সবাই সংকর মঙ্গোলীয়। ওরা অবিমিশ্র মঙ্গোলীয় হলে, তাদের ভাষায় ও নামকরণে অবশ্যই মঙ্গোলীয় উপাদান অবশিষ্ট থাকতো। অনেকের ভিন্ন ভাষা গ্রহণের নজির থাকলেও, আদি ভাষার অবশেষ সবার মাঝেই কম-বেশী থাকে, যেমন আর্যদের দুনিয়াজোড়া বিস্তৃতি সত্বেও ভারতীয়রা বলে মাতাপিতা, ইরানিরা বলে মাদর পিদর এবং ইংল্যান্ডবাসীরা বলে মাদার ফাদার। এভাবে সবার মাঝেই আর্য ভাষার মৌলিকত্ব বিদ্যমান। এটা মানবিক শ্রেণী

নির্ণয়ের প্রধান শক্তিশালী উপাদান।

চাকমাদের শ্রেণী নির্ণয়ের ব্যাপারে, তাদের গৃহীত খেমার চরিত্রের বর্ণমালা কিছু বৈপরিত্যের সৃষ্টি করে। তবে তা তাদের আরাকান ও দক্ষিণ বার্মার পেগু অঞ্চলে দীর্ঘ প্রবাসের উপজাত ভাবাই সঙ্গত। কারো কারো মতে এতেও ভারতীয় ভাষা ও বর্ণের মিশ্রণ আছে। বর্ণগুলো মাত্র আকৃতিতেই খেমার চরিত্র ভিত্তিক। কিন্তু নামে ও বর্গের উচ্চারণে বাংলা অনুসারী তথা ভারতীয়। বর্মী ও ইন্দোচীনী ভাষার অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক শব্দই চাকমা ভাষায় বিদ্যমান, যা তাদের দীর্ঘ প্রবাসের উপজাত। আদতে তারা তথাকার আদি বাসিন্দা হলে, অধিক সংখ্যায় বর্মী ও ইন্দোচীনী শব্দই তাতে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক জাতির নাম ও ক্রিয়াপদে ফল্গুধারার মত আদি ভাষার অবশেষ অক্ষুণ্ন থাকে, এবং তাতে জাতিগত মৌলিকত্ব নির্ণীত হয়। চাকমাদের নামেও ভাষায় ভারতীয় মৌলিকত্ব বিদ্যমান থাকায়, তাদেরকে ভারতীয় মূলের আরাকানী লোক ভাবা যায়।

আরবী ও পালি ভাষার বর্ণমালার মত চাকমা বর্ণমালা আকারে উচ্চারিত হয়, এবং নামগুলো আকৃতি জ্ঞাপক এবং বাংলা বর্ণমালার নাম সম্বলিত। বাংলা বর্ণ বিন্যাস ও স্বরচিহ্ন তাতে গৃহীত। এককালে তাদের মাঝে আরবী বর্ণের চর্চাও প্রচলিত ছিলো, যার প্রমাণ নয়টি রাজকীয় সীলমোহর।
ধর্ম-বর্ন সম্প্রদায়-সমাজ ও অঞ্চল নির্বিশেষে সব বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ভাষা, বর্তমানে এক সর্বসম্মত অভিন্ন কথ্য বাংলার রূপ ধারণ করলেও, প্রত্যেকের নিজ নিজ গন্ডিতে পৃথক ব্যবহারিক ও সামাজিক ভাষা সর্বদাই ভিন্ন। পূর্বে হিন্দুয়ানী বাংলা ও মুসলমানী বাংলার পৃথক দুধারা প্রচলিত ছিলো, এবং এখনো তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। একজন হিন্দু কারো ডাকে আজ্ঞা বলে সাড়া দেন, কিন্তু একজন মুসলমান সে ক্ষেত্রে বলেন জি। মুসলমানরা যাকে বলেন হুজুর, হিন্দুরা তাকে সুধান কর্তা। এমনি সুফিকে সাধু, ফকির দরবেশকে মুণিঋষি ইত্যাদি। কিছু বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ যথাঃ বেহেশত, দোজখ, গোসল, ওক্ত, আওয়াজ, গুনাহ, ছোয়াব, মর্দ, পাক, নাপাক, আজাব, পানাহ, ফরজন্দ, হারাম, হালাল, তকদীর, হায়া, শরম, হায়াৎ, মৌৎ, রিজেক, দৌলত ইত্যাদি খাটি মুসলমানী শব্দ। অমুসলিম সমাজে এ জাতীয় শব্দাবলী কচিত ব্যবহারের নজির আছে। অনুরূপভাবে হিন্দুয়ানী শব্দ যা সংস্কৃত ও দেবদেবী ঘেষা, তা মুসলমান সমাজে, কমই ব্যবহৃত হয়, যথাঃ ঈশ্বর, ভগবান, স্বর্গ, নরক, শ্রাদ্ধ, জল, যারজ, স্নান, আহ্নিক, আত্মা, খুড়া, পিসি, ঠাকুরদা, শুচি, অশুচি ইত্যাদি। সাজপোষাক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের আধুনিক ধারায় অনেকের ধর্ম ও সামাজিক পার্থক্য ধরা না গেলেও, আন্তরিক ও ঘনিষ্ট আলাপে ভাষাজাত পার্থক্যের পৃথক পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চাকমা সাহিত্য ও লোকগীতির ভাষাকে বিশ্লেষণ করে, এমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তাতে মুসলিম ভাষা চরিত্রের প্রভাবই বেশী। রাধা মোহন ধনপতি নামীয় লোকগীতির ভাষা লক্ষ্যণীয়, তাতে একটি আরবী বাক্যাংশই স্থান করে নিয়েছে, যথা ঃ লবিয়ং সবিয়ং

থুম, মানে আদর আপ্যায়ন শেষ। থুম আরবী তামের বিকৃতি, যার অর্থ শেষ।
(সূত্র ঃ রাধা মোহন ধনপতির বিবাহ পর্ব)
এই একই পালার দ্বিতীয় উদাহরণ হলো ঃ
'অইয়োন গাভুর মর্দে আধা লাংগ্যা আধা নেক।'
এখানে মোট সাতটির মধ্যে পাঁচটি খাটি মুসলমানী শব্দ। লাং উপপতি এবং নেক স্বামী অর্থে ব্যবহৃত বাঙ্গালী মুসলমানদের খাটি সামাজিক শব্দ। মর্দ শব্দটি ও মুসলিম বাঙ্গালীদের ব্যবহৃত। এভাবে চাকমা ভাষা বিশ্লেষণের দ্বারা, উক্ত ভাষায়, মুসলমানী ভাষা ঐতিহ্যের প্রাচুর্য্য উদঘাটিত হয়, যা এককালে তাদের মাঝে ঐ সমাজের লোকদের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটার প্রমাণ। ভাষাগত সংমিশ্রণ, শিখানো বুলি বা অনুকরণ জাত কিছু নয়। নতুবা হিন্দু সমাজ সর্বাগ্রে তাদের প্রাচীন প্রতিবেশী ও রক্তের অংশীদার মুসলমানদের ভাষা ঐতিহ্যে অধিক অভ্যস্ত হতেন। তারাও চাকমাদের মত ঈশ্বরকে খোদা বলে সম্বোধন রপ্ত করে নিতেন।
এমনি চাকমাদের নামের সাথে খাঁ ও বিবি ব্যবহারের ধারা, প্রভাব বা অনুকরণজাত ভাবা যায় না। তাদের অনুসৃত মুসলিম নামকরণ রীতির প্রথম উদাহরণ হলো, তৃতীয় রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈনিক রাজার মেয়ে মানিক বি। উক্ত বি. যা বিবি শব্দের অপভ্রংশ, প্রমাণ করে যে তখন ছিলো মুসলিম আমল, এবং মানিক বি নিজে হয় মুসলিম ছিলেন, অথবা মুসলিম স্বামী সুত্রে তিনি বিবি উপাধি লাভ করেছেন। তবে কোন সুত্রেই তখন তাদের উপর অপ্রতিরোধ্য মুসলিম প্রভাব ছিলো বলে জানা যায় না। লোককাহিনী সুত্রে তখন তারা আরাকানের অভ্যন্তরে বিজিত রাজ্যের অধিবাসী রাজপুরুষ। সুতরাং মুসলিম ধর্ম নাম উপাধি তাদের উপর আরোপিত ভাবার অবকাশই নেই। অনেকে বিকৃত অর্থহীন এবং বিজাতীয় উপসর্গ সম্বলিত নামধারী হলেও, তারা অমুসলিম ছিলেন, এ দাবীও প্রামাণ্য নয়। রাজা শের জব্বার খার সীলমোহর সূত্রে ও বলা যায়, চাকমা রাজবংশের কার্যতঃ ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হওয়া সন্দেহজনক। নাম, উপাধি, ভাষা ও আচরণের চরিত্রগুণে, সাধারণ আর অভিজাত অনেক চাকমার রক্ত ও ধর্মের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নির্ণীত হয়, যা অতীতে উভয়ের মাঝে সংমিশ্রণ ও একাত্মতা ঘটার লক্ষণ।

চাকমা সমাজের উদারমনা পন্ডিতদের কেউ কেউ স্বীকার করেন এবং অনেক লেখক ও উল্লেখ করেছেন যে, অতীতে চাকমা মহিলাদের লাশ কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো। এখনো দেখা যায়, জুমিয়া, টুংটুংগ্যা ও স্যাক মেয়েরা, চিকন গলাও ভরা হাতা ফতুয়া পরে, বুকে এক খন্ড কাপড় পেচায় ও মাথায় পাগড়ি বাঁধে, এবং দীর্ঘ পিননে নিম্নাঙ্গ ঢাকে। যদ্বারা ভালভাবেই তাদের শারীরিক পর্দা পালিত হয়। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় ছতর ঢাকা বা আব্রু করা বলে। চাকমা ভাষার যৌন অঙ্গগুলো ঢাকাকে হুবহু আব্রু আর ছদর ঢাকা বলে। ছদর শব্দটি ছতরেরই অপভ্রংশ, যার অর্থ গোপন অঙ্গ। শব্দটি মূলতঃ আরবী। ইসলামী নিয়মে ছতর হলো পুরুষদের বেলায় নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মেয়েদের বেলায় মুখ মন্ডল, কব্জি পর্যন্ত হাতের

অগ্রভাগ এবং ঘন্টির অগ্রভাগ পা বাদে সমস্ত শরীর। পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ছতর বা গোপন অঙ্গ ঢাকা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়। ইসলামী নীতিতে বিবাহের পাত্রীকে মোহরানা বা কন্যাপণ দান ফরজ। চাকমা সমাজেও দাবা নামে এটা প্রচলিত। শব্দটি আরবী দাওয়ার অপভ্রংশ, যাকে বাংলায় বলে দাবী। অনুরূপ পুরুষ মুসলিমদের মত চার পর্যন্ত একাধিক বিবাহ রীতিও তাদের মাঝে প্রচলিত। জন্মগত কারণেই ভিন্ন সমাজের নাম, পদবি, ধর্মাচার, ভাষা ও আদব কায়দার অনুপ্রবেশ প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজে ঘটে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমানেও বিদ্যমান। রাঙ্গামাটির অধিবাসী নিহত হানিফ বিহারীর উপজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলে-মেয়েরা নামে, ধর্মে ও ভাষায় সংকর চরিত্র সম্পন্ন। এই একই ক্ষেত্রে মাঝির বস্তির মৃত রাজ্য ধনের মেয়েটিও মৃত মুসলিম স্বামীর ঔরশজাত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কখনো মুসলিম, কখনো বৌদ্ধ আর কখনো খৃষ্টান পরিচয়ে পরিচিত। চিত মরমের মরহুম লবির আহমদ চৌধুরীর উপজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের সবাই নির্ভেজাল মুসলিম ঐতিহ্যের অধিকারী নয়। এদের সবাই নাম পদবি, ভাষা, আদব কায়দা ও ধর্মানুসরণে মিশ্র ধারার অনুসারী। এমনিভাবেই রাইংখ্যং মুখের অধিবাসী রকিব আলী মাহুতের উপজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের কেউ কেউ নামে ঐতিহ্যে মুসলমান, কিন্তু আত্মীয়তা ও সামাজিকতায় মাতৃবংশের সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপ প্রত্যক্ষ উদাহারণের সংখ্যা ভূরি ভুরি, যা অতীত ঘটনাবলীরই হাল প্রতিচ্ছবি। সুতরাং ঔরশজাত সন্তানদের দ্বারা পিতৃ-মাতৃ ঐতিহ্য, প্রতিপক্ষীয় সমাজে সংক্রমিক হওয়া এবং অনুরূপ সংকর জাতের লোকজনের দ্বারা জন্মে প্রজন্মে, নামে খেতাবে, ভাষায় আর আচরণে মিশ্র ঐতিহ্যের সংক্রমণ ঘটা সম্পুর্ণ সম্ভব। চাকমাদের পক্ষে ঐ মিশ্রণধারা থেকে মুক্ত আর বিশুদ্ধ থাকা প্রমাণিত নয়। নাম, খেতাব, ভাষা ও আদব-কায়দার সাথে ইসলাম ধর্মীয় অনেক উপসর্গ প্রবিষ্ট থাকায়, তাদের খন্ডিত মুসলিম পরিচিতি বা মিশ্র জাতিসত্তা প্রমাণিত। মুসলিম আত্মীয় কুটুম্ব থাকার অর্থেই খিসা বা খেশা, দেওয়ান, তালুকদার, খাঁ ও বিবি খেতাবের প্রচলন ঘটা সম্ভব। হালের উত্তেজনাকর রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্বেও, সে মৌলিক পরিচয় স্বীকার্য, যা কার্যতঃ উভয়ের মাঝে জাতিগত সম্প্রীতি রচনার এক গুরুত্বপুর্ণ সেতুবন্ধনরূপী সূত্র হওয়ার যোগ্য।

উপজাতীয় মৌলিকত্ব।

অতীতে ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রামের পূর্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে, বিভিন্ন সময় মগ, কুকি ও ত্রিপুরাদের আগমন নির্গমন ঘটলেও তাদের খুব কম সংখ্যক লোকই এতদাঞ্চলে স্থায়ী পুনর্বাসন গ্রহণ করেছে এখানে কৃষি কাজে ভূমি ব্যবহারকারী স্থায়ী প্রধান অধিবাসী হওয়ার গৌরব একমাত্র বাঙালীদের প্রাপ্য। যদিও তখন লোকবসতি ছিলো বিরল, এবং অধিকাংশ পাহাড়াঞ্চল ছিলো অনাবাদী। কুকি, মগ ও ত্রিপুরা বাদে, অন্যান্য উপজাতিদের নাম পরিচয় আর অস্তিত্বের কথা সর্বাধিক বৃটিশ আমলেই গোচরীভূত হয়। ঐ আমলের শুরুতে দুরবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী বিভিন্ন উপজাতীয় লোকের, এতদাঞ্চলে আগমন ও তজ্জন্য অরাজকতা ঘটেছে। বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণেও বটে, বহিরাগমন ব্যাপক ও তরান্বিত হয়। এসব ঘটনার বিবরণ সেকালের সরকারি রেকর্ডপত্রে বিষদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এবং তা নিয়ে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক বই পুস্তক ও রচিত হয়েছে। পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়া ও ডে বারোজের ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় অংকিত প্রাচীন বাংলার একটি মানচিত্র হলো সর্বাধিক প্রাচীন দলিল, যা চাকমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম তথ্য প্রদান করে। অন্যান্য প্রাচীন তথ্যগুলো উপজাতীয় কিংবদন্তি থেকে গৃহীত। সুতরাং তা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয়। তৎপর আমরা অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণা নিবন্ধ 'অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস থেকে অবগত হই, জনৈক শের মস্ত খাঁ-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তদীয় অনুসারী স্বল্প সংখ্যক চাকমাসহ আরাকান ত্যাগ করে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে, মোগলদের অধীন চট্টগ্রামের কোদালা অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে, পুনর্বাসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে দক্ষিণ চট্টগ্রাম সীমান্ত অঞ্চলে উপজাতীয় রাজা হিসাবে জনৈক চন্দন খাঁ ওরফে তৈন খাঁ ১৭১১ খ্রীঃ সালে আবির্ভূত হোন, যার বংশধরনের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ, ১৭২৪ খ্রীঃ সালে, অবাধ্যতার কারণে, মোগল শক্তি কর্তৃক আরাকানে বিতাড়িত হোন। তাদের কার্যকাল মাত্র ১৩ বছর দীর্ঘ। বর্ণিত এই চন্দন খাঁ বংশ ও তাদের উপজাতীয় অনুসারীদের পরিচয় পরিষ্কার নয়। তাদের সাথে চাকমা ও শের মস্ত খাঁ বংশের সম্পর্ক থাকা অনিশ্চিত। উভয়ের আগমন ও নির্গমনকালের মাঝখানে তের বছরের এক ফাঁক বিদ্যমান। মার্মা বা মগেরা নামেই বর্মী পরিচিত। ত্রিপুরা ও লুসাই জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম থেকে আগত। চাকমাদের রাজা শের জব্বার খাঁনের সীলমোহরই প্রমাণ, তারা বৃটিশ পূর্ব পর্যন্ত

আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। চাকমা রাণী কালিন্দির মন্দির লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, তাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শের মস্ত খাঁ। একটি চাকমা ছড়া গানেও এভাবে তাদের আদিবাস বিবৃত হয়েছে।
যথা ঃ

'আদি রাজা শের মস্ত খাঁ
রোয়াং ছিল বাড়ী
তারপর শুকদের রায়
বান্ধে জমিদারী।'

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে চাকমাসহ উপজাতিদের আদি বসবাস ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। তারা এতদাঞ্চলের প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর। তাদের নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা আনুষ্ঠানিকভাবে আদি বাংলাদেশী হওয়া প্রশ্ন সাপেক্ষ। বাঙ্গালী নয়, আদি বাংলাদেশীও নয়, মূলতঃ তারা অস্থানীয় বংশোদ্ভূত। এই হলো তাদের মূল পরিচয়।

আরাকানবাসী মগ ও চাকমাদের বিপুল সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ ও চট্টগ্রাম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় ও প্রধান ঘটনার কাল হলো, প্রাথমিক বৃটিশ আমল, যার বিশদ ও নিরপেক্ষ বিবরণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লেখনীতে পঠনীয়, যিনি এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় একজন নির্ভরযোগ্য প্রধান পন্ডিত। তার বিবরণ, যথা ঃ

A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong hill's undoubtedly came about two generations ago from Aracan, This is asserted both by their traditions and by records in the Chittagong collectorate. It was in some measure due to the erodus of our hill tribes from Aracan that the Burmese War of 1824 took place which ended in the annexation to British territory of the fertile Province of Aracan. As this is a point interesting not only from its local bearing on the hill tribes but also in a larger and more important historical sense, I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorities and the Burmese, which eventually culminated in war, hinged in a great measue upon refugees from the hill tribes who fleeing from Aracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese.

Among the earliest records that we have of our dealings with

the Burmese, are two letters, written, one by the king of Burmah, the other by the Rajah of Aracan to the chief of Chittagong and received on the 24th June 1787.
(Ref : The Hill Tracts of Chittagong and The Dwellers Therein. page 28/29)

বাংলা ঃ 'উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে তাদের অধিকাংশ প্রায় দু'পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটা দ্বৈতভাবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত, যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয় লোকজনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদ্দরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের বর্মীযুদ্ধ সংঘটিতহয়। ওটা বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপজাতিগুলোর কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণে ও বটে হৃদয়গ্রাহী। আমি এখানে সে ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো, পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উত্থাপন করেছেন।

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাধিক প্রাচীন দলিল হলো দু'টি চিঠি যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত হয়, তা ২৪ জুন ১৮৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন পৃঃ ২৮/২৯)।
মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠি খানার পরিপুর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেন ঃ

This letter is explicit enough. The fugitives referred to are evidently men of the chakma and mrung hill tribes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Aracan, The persons in question were probably the chiefs of the clans, and the driving of them from British territory would have been equivalant to the expulsiong of the whole clan,

বাংলা ঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকেরা প্রমাণিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরুং সম্প্রদায়ের লোক, যারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃতিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ তাদের

সমাজপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ গোটা সম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ।
এবার আরাকানের রাজার প্রদত্ত চিঠিখানা প্রণিধান যোগ্য, যথা ঃ

"From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we have ever been on terms of friendship and the inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries belonging to each of us, A person named keoty having absconded from our country, took refuge in yours, I did not however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that Keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possession refused to sent him to me. I also am possessed of extensive country and keoty in consequence of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed,

"Domcan chakma, and Kiecopa lies Marring and other inhabitants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border and exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he had with him, Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them, because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robbers. It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan, and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may be secured. If you do not drive them from your country and give them up, I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your rerritories they may be, I send this letter by Mohammed Wassen. Upon the receipt of it, either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer

immediately (Page : 29)

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের প্রতি। আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত, এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় আর অবাধে আমাদের দেশসমূহের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। কেউটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে সসৈন্যে খুঁজে পেতে নিযুক্ত নই, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেউটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুলে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি তার অবাধ্য আচরণ আর আমাদের রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাব গুণে ধ্বংস হয়ে যাবেই।

ডোমকান (খান) চাকমা, কায়কোপা, লাইজ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশে-পাশে আশ্রয় নিয়েছে এবং উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহনায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটা শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু, তারা নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে, আমার রাজার প্রতি আবাধ্য, এবং দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত, সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও যারা আরাকান থেকে পালিয়েছে, আশ্রয় দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচিন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানে তারা থাকুক না কেন, একদল সেনা নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠিয়েছি। এটা বুঝে পেয়ে হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, আর তাদেরকে আশ্রয় দিবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরের জানাবেন।
(সুত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)
মিঃ লুইন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন, যথা ঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the sirder of Arracan. The Chief of

Chittagong in the same month of june writes to the Governor General in council reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance untill this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugees should be driven out of British trrritory. He adds also that these fugitives ware persons of some consequence in Arracan, and reports further ahat a Chakma Sirder, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by atating his opinion that this sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jugles for the convenience of plundering. Ten Years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31 st May, from the Chief of Chittagong to the Honourable Warren Hastings Governor General that some thousands of hillmen had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and (Macfarlane's History of British India Page 355) records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious Chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius torturs.'

In 1809 Macfarlane records that disputes continued to occur in the frontiers of Chittagong and Tipperah, but organized forays into that territory hardly assumed any definite form until 1823 (Wilson's Narrative of the Burmese war page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824, the primary cause, therefore, of all these disturbance, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtedly the immigration to our hills of tribes hitherto subject to their

authority.
The origin of the tribes is a doubtful point, Pemberton ascribes to them a maloy descendant. Colonel sir A, phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of mayamma or Burmese extraction. Among the tribes themselves no record exists, seve that of oral tradition, As to their origin, the Khyoungtha alone are possessed of a written language. They have among them several copies of the Raja Wong, or Histrory of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The tongtha on the other hand posses no written character, and the languages spoken by them are simply to a degree expressing merely the wants and sensations of uncivilized life. The information obtainable as to their origin and past history is therfore naturally meager and unreliable (page : 32/33).

বাংলা ঃ 'এই চিঠিগুলো লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় পাওয়া গেছে। এগুলো পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র বর্মী সৈন্য আমাদের শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদন লিখে পাঠান যে, তাকে মৈত্রী রক্ষায় অবজ্ঞা করা হয়েছে। যদ্দরুণ আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে এটাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু সমতল ভূমিতে শান্তিপূর্ণ চাষাবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতোমধ্যে পাহাড়ে ও বনে আস্তানা গড়ে নিয়েছে, যাতে লুটপাটের সুবিধা হয়। এর দশ বছর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১মে তারিখের আরেকটি চিঠি, যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন দানের আশ্বাসে উদ্বীপ্ত ছিলো। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়েছে। মেকফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক

বৃটিশ ইন্ডিয়া'র ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৯৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারদের, যাদেরকে তারা ডাকাত বলে, ধাওয়া করে বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে হানা দেয়। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহনকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে ধরে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়, যাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।
মেকফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে বিরোধ অব্যাহত ছিলো। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত কমই সফল হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত 'নেরেটিভ অফ বার্মিজ ওয়ার' পৃষ্ঠ : ২৫)।

সে সময়ের সংঘটিত ঘটনাবলী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলে। দেখা যায় এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে সে কারণটি হলো ঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ ও আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভুত বলে নির্ণয় করেন। কর্নেল স্যার ফেইর অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়াম্মা বা বর্মী লোকোদ্ভুত। উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত, মূল বৃত্তান্তের কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংথা পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক রাজাওং বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি তাদের পর্বতবাসের জীবন বৃত্তান্তের কোন তথ্যই অবগত হতে পারিনি। অপর পক্ষে 'টংথা' নামীয়রা কোনরূপ লেখ শৈলীর অধিকারী নয়। তাদের কথাবার্তা হলো কোন মতে চাহিদা আর অনুভূতিকে ব্যক্ত করা, যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তি। তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য । (সূত্র : ঐ ৩২/৩৩)।

মিঃ লুইন ও কর্ণেল ফেইর আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতাত্ত্বিক। তারা নিজেদের কর্মজীবনের দীর্ঘকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানে সরকারী দায়িত্ব পালনে ও তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যয় করেছেন। তাদের বর্ণনাগুলোকে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ভাবা হয়ে থাকে। গত শতাধিক বছরেও তাদের বর্ণনা গুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বা অসত্য প্রমাণিত হয়নি। খোদ উপজাতীয় পন্ডিতদের অনেককে তাদের বর্ণনার সুত্র ধরেই নিজেদের অতীত অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিদের অধিকাংশ আরাকানী শরণার্থীদেরই বংশধর, এদেশের আদি অধিবাসী নয়, এবং তাই তাদের আদি

জাতীয়তা বাংলাদেশী হওয়া বিতর্কিত। উপজাতি সমূহের আগমন নির্গমন ও বসবাসের মৌলিক তথ্য তাদের সংরক্ষিত কিছু দলিল প্রমাণ নিদর্শন ও চর্চিত গানের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তাতেও সমর্থন মিলে যে, তাদের অধিকাংশ বার্মা ও আরাকান থেকে আগত, আর অবশিষ্টরা আসাম ও ত্রিপুরার অধিবাসী। তারা শরণার্থী ও প্রবাসী থাকা অবস্থায়, বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী, যারা কয়েক পুরুষ আগেও আইনতঃ বিদেশী আর অস্থানীয় ছিলো। তবে নতুন প্রজন্মের উপজাতি আর বাঙ্গালীরা তাদের মৌলিকত্বকে ভুলে আছে। উপজাতি সংক্রান্ত এতদাঞ্চলের প্রামাণ্য অতীত ঘটনাবলী গ্রন্থনা ও চর্চার অভাবে মারাত্মক তথ্য শূণ্যতায় সৃষ্টি হয়েছে। তাতে জ্ঞানী গুণী, সাধারণ আর সরকারী কর্মচারীরাও বটে, এতদাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসী নাগরিক হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এই ভুল মূল্যায়নের ভিত্তিতেই উপজাতিরা বৈষম্য আর উৎপীড়নের অভিযোগ উত্থাপন সহ স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে সোচ্চার। অথচ অবিতর্কিত স্থায়ী নাগরিকদের পক্ষেই কেবল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দাবী উত্থাপন করা সম্ভব। প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিদের জাতীয়তা আদি বাংলাদেশী নয়। আনুগত্যহীনতার কারণে বিহারী মুসলমানেরা যেমন বিদেশী ঘোষিত, ঠিক অনুরূপভাবে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিরাও রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহী বলে নাগরিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য। তাতে আপত্তি করার কিছুই নেই।

এবার আমি সুধী পাঠক মহলকে ইংরেজ পন্ডিত বি আর পার্নের একটি গবেষণা তথ্য উপহার দিয়ে অবগত করতে চাই যে, চামকাদের কল্পিত মইসা গিরি বা মনিজা গিরি কাহিনীটিও একটি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান। বর্ণিত তথ্যটি নিরপেক্ষ ও সরকারী গোয়েন্দা রিপোর্টের দ্বারা সমর্থিত। মইসাগিরি ঘটনার কার্যকাল, বাংলায় বৃটিশ শাসন শুরুর অর্ধ শতাব্দীর ভিতরই নির্ণীত হয়। বি আর পার্নের বর্ণনাতে খাটি ও নিভুর্লযোগ্য হওয়ার সমুদয় গুণই সন্নিবেশিত আছে। তাতে প্রমাণিত হয় চাকমাদের দাবীকৃত প্রাচীন জাতীয় রাজ্য মইসাগিরি আদতে আরাকান ভাগের নাফ নদী তীরে অবস্থিত একটি ছোট্ট ভূভাগ মাত্র, যা সেখানে মুরুসুগিরি নামে অভিহিত ছিলো। তা ঐ নামের জনৈক স্থানীয় সর্দারের নিজ নামে অভিহিত ভূসম্পত্তি। রাজ্য হওয়ার যোগ্য বিরাট কোন ভূভাগ নয়। তাদের দাবীকৃত অপর জাতীয় রাজ্য ও রাজধানী আলী কদমের বেলায় ও অনুরূপ বিভ্রান্তি বিদ্যমান। বাংলার ইতিহাসের দ্বারা এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়া ও ডে বারোজের বর্ণিত কোদা-ভোস-কাম আসলে একতাঞ্চলীয় হোসেন শাহী শাসন কর্তা খোদা বখশ খান, এবং লোভাস ডোকাম কার্যতঃ তারই শাসিত অঞ্চল ও সদর দফতর আলী কদম। চাকমারা বড়জোর ঐ মুসলিম শাসক ও রাজ্যের আশ্রিত ভক্ত প্রজা হয়ে থাকবে। কথিত চাকমা অঞ্চলটি বার্মা বা আরাকান অভ্যন্তরের দখলকৃত মুসলিম উপনিবেশ হওয়াও সম্ভব। চাকমা লোকহাহিনীতেও স্বীকৃতি আছে যে, মগদের উৎগীড়ণে বিতাড়িত হয়ে তারা চট্টগ্রামের মুসলিম শাসিত অঞ্চলে আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করে।

এই সুবাদে মুসলিমরা তাদের স্বপক্ষ এবং মুসলিম শাসিত অঞ্চলই তাদের স্বরাজ্য বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ তাদের মাঝে তখন মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্কের শিথিল বন্ধন কার্যকরও ছিল। যার প্রতিফলন হিসাবে মুসলিম নাম খেতাব, ভাষা ও আচার আচরণের অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা থেকে তারা বর্তমান বিরূপ পরিস্থিতিতে ও মুক্ত নয়।
মিঃ বি আর পার্নের উদঘাটিত তথ্যটি এবার পতিধান যোগ্য যথা ঃ

Thirteen years before at the time of the mogh immigrations of 1798, an Arakanese chief who was known to the English as 'moorusugeeree' had flied into Chittagong' followed by many adherents' for he had been popular with his people. It was he who had invited king bodawpaya to seize the crown of Arakan; but he had quarrelled with the Burmese and had settled with the permission of the Company's officers at hurbung. The English knew him as 'Moorusugeeree which they thought: was his name, whereas it is evidently the title 'Myothugyi'. His real name was Nga Than De. He had a son named chin Pyan, who was called by the English 'King bering'. or King-buring'. Chin Pyan's own account of his father and of himself is as follows :

In 1146 Mogh the country of Aracan was overrun with plunderers. In consequence my father addressed a letter to the King of Ava who sent an army and took possesion of Arracan. The king looking on my father as a person of royal blood, put him in possession of the Government of Arracan, retaining only the name of sovereign to himself. In 1160 (Mogh) the said king demanded from my father a quota of 20,000 muskets and 40,000 men to make war on Siam. My father consented to furnish the half of this demand. The King was angry at not getting the whole, and seized my brother and killed him. On this account my father with his relatives and friends, and all his adherents, consisting of most of the inhabitants of that country, emigrated. My father died. We sought refuge in the English territory, and I concealed mayself at Hurbung. Mr. Cox at this time came to Ramoo by order of the Government and distributed food and imple-

ments for cutting the jungles, to all the Moghs. They culti-vated the ground and thus earned a subsistence. Mr. Cox made every search for me, but through the operation of my civil destiny he did not find me. After the death of my father, my mother took everything he possessed. I got nothing.

Chin pyan's father had apperently before he fled to Hurbung owned an area of land near the banks of the Naaf river, which formed the boundary between Indian and Burmese territory. This land derived from its owner the name of 'Moorusugeeree'. When he fled from Arakan. Nga Then De had abandoned his property, but early in the year 1811 Chin pyan left Hurbung and took possession of it. professing to act as agent for a mohammedan, Saddodeen Chaudry', who had induced the Collector of Chittagong to give him docu-mentary recognition of his ownership. Although, it whould appear, the Collector did not know exactly where the land was.
(Ref : Journal of Burma Research Society : the king Bering Page 44/48) dated 13.11.1933.
'মগদের ১৮৯৮ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশ (আরাকান) ত্যাগের তের বছর আগে, একজন আরাকানী সর্দার, যিনি 'মুরুসুগিরি নামে ইংরেজদের কাছে পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। বহুসংখ্যক অনুসারীও তার সঙ্গী হয়। তিনি নিজের ঐ জনগণের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। বার্মার রাজা বোদাপায়াকে আরাকানের সিংহাসন দখলের জন্য তিনি আহ্বান করে আনেন। তবে তিনি বর্মীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন, ফলে (ইষ্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনুমতিক্রমে হারবাং অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইংরেজরা তাকে মুরুসুগিরি হিসাবে জানতো, যা তার নাম বলেই তাদের ধারণা ছিল। অথচ এ প্রমাণ আছে যে, তার উপাধি ছিলো মাইয়োথুগ্যি (সম্ভবতঃ মৈসাগিরি) আসল নাম গো থান দে। চীন পিঁয়া নামীয় তার এক ছেলে ছিলো যাকে ইংরেজরা রাজা বেরিং বা বারিং নামে ডাকতো। চীন পিঁয়ার নিজের বর্ণনায় তার বাবা ও নিজের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ
১১৪৬ মঘী সনে (১৭৮৪ খ্রীঃ) আরাকান দেশটি অরাজক লোকদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সে পরিস্থিতিতে, আমার বাবা আভার রাজাকে একখানা চিঠিতে আহ্বান করেন, যিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে আরাকান দখল করে নেন। রাজা আমার বাবাবে রাজরক্তের অধিকারী দেখে আরাকান সরকারের প্রাধান্য প্রদান করেন, এবং নিজে অধিকারে শুধু সার্বভৌম ক্ষমতাই রাখেন। ১১৬০ মঘী সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) শ্য

দেশের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজা আমার বাবার কাছে ২০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী চেয়ে পাঠান। তাতে তিনি অর্ধেক পর্যন্ত দাবী পূরণের সম্মতি জানান। পরিপুর্ণ দাবী পূরণ না হওয়াতে রাজা রুষ্ট হোন ও আমার ভাইকে আটক এবং পরিশেষে হত্যা করেন। এহেতু বাবা নিজের সমূদয় স্বজন পরিজন ও অনুসারীদের সহ স্বদেশ ত্যাগ করেন, যারা সংখ্যায় ছিলেন, সে দেশের গরিষ্ঠ অধিবাসী। বাবা মারা যান। আমরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে আশ্রয় নেই ও আমি নিজেকে হারাবাং অঞ্চলে গোপন করি। মিঃ কক্স এ সময় সরকারের আদেশে রামুতে আসেন এবং খাদ্যবস্তুসহ মগ বসতির ভিতর জঙ্গল পরিষ্কারের যন্ত্রাদি বিতরণ করেন। তারা জমিগুলোতে চাষাবাদ শুরু ও তাতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। মিঃ কক্স গভীরভাবে আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হোন। কিন্তু আমার প্রকাশ্য আস্তানার সন্ধান ও আমার সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হোন। আমার বাবার মৃত্যুর পর, তাঁর পরিত্যক্ত সবকিছুই আমার মা নিজে হস্তগত কনে নেন। আমি তার কিছুই পাইনি। অতঃপর মিঃ বিং আর পার্ন মুরুসুগিরি অঞ্চল সম্বন্ধে নিম্নরূপ অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেন, যথাঃ হারবাং অঞ্চলে পলায়নের আগে নাফ নদীর তীরে চীন পিঁয়ার বাবার প্রকাশ্য বিশুদ্ধ মালিকানাধীন একখন্ড ভূ-সম্পত্তি ছিলো, যা ভারত ও বার্মার মধ্যবর্তী সীমান্ত চিহ্নিত করে। এই জায়গাটি তার মালিকের পরিচয় বহন করে একই মুরুসুগিরি নামে অভিহিত ছিল। ১৮১১ খ্রীঃ সালের শুরুতে চীন পিঁয়া হারবাং ত্যাগ করে এই বলে ঐ জায়গাটির দখল নেন যে, তিনি জনৈক মুসলিশ সাদুদ্দীন চৌধুরীর প্রতিনিধি, যিনি চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে এ জমির মালিকানা দলিল অণুমোদনে বশিভূত করেন। যদিও মনে হয়, ঐ রাজস্ব কর্মকর্তা, জায়গাটির অবস্থান কোথায় তা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না। স্ক্র (সুত্র ঃ জার্নাল অফ বার্মা রিসার্চ সোসাইটি পৃঃ ৪৪-৪৮ তাং-২৩/১১/১৯৩৩ খ্রীঃ)।
তৎপর মিঃ বি আর পার্ন, বর্ণিত চীন পিঁয়া ও তার অসংখ্য অনুসারীদের বাংলার সীমান্ত অভ্যন্তরে ও আরাকানের গভীরে উপর্যুপরি অরাজকতা ও অভিযান পরিচালনা, ও তদ্দারা বার্মা সরকারের সাথে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধের বর্ণনা প্রদান করেছেন।

তাতে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুরুসুগিরি তথা মইসাগিরি ও তার সাথে সম্পর্কিত চাকমা ও অন্যান্য জনসাধারণের মৌলিক আবাসক্ষেত্র বাংলাদেশ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিকালের কাছাকাছি সময় কাল যখন বৃটিশ শাসনের প্রায় চার দশক অতিবাহিত, তখনো বাংলাদেশ অঞ্চলে চাকমাদের আগমন নির্গমন অব্যাহত ছিলো। অতএব এটা সন্দেহাতীত যে, চাকমা ও তাদের সঙ্গীসাথী উপজাতিরা আসলে বিদেশী আরাকানী বংশোদ্ভূত। এবং তাদের বহুল কথিত রাজা মৈসাং আসলে উপরে বর্ণিত মৈথুগ্যি বা মৈসাগিরি যিনি ব্রিটিশ আমলের লোক।
চাকমাদের সম্পর্কে অপ্রিয় হলেও আরো দায়িত্বশীল বক্তব্য আছে, যথা ঃ

1. The Most reasonable account of their origin is that they

are the products of unions between the Nowab Saista Khan's solders and mogh women and that the caste or clan was formed within the last 200 years or so,
(Ref : Selection from the correpondence on the revenue administratin of Chittagong Hill Tracts, Page : 276

বাংলা ঃ তাদের মৌলিকত্বের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হলো, তারা নবাব শায়েস্তা খাঁর সৈন্যবাহিনী ও মগ স্ত্রীলোকদের পারস্পরিক মিলনজাত প্রজন্ম। গত দুশত বছর বা অনুরূপ সময়ের ভিতর তাদের বর্ন ও শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে।
(সুত্র ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহ, পৃঃ ২৭৬)

2. The Chakma's are mongolied race, probably of Arakanies origin, though they have inter merried largely with Bengalies. They are divided in three subtribes : Chakma, Duingnak and Tanchangya. The Duingnak broken away from the main tribe a century ago, and flied to Arakan. Of later years some have returned to cox's bazar sub-division of Chittagong districts.
(Ref : Provincial Garatteer of India Page : 410/1941)

বাংলা ঃ চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভূত। যদিও তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপকভাবে আন্তঃ বিবাহে আবদ্ধ। তারা নিজেদের মাঝে তিন শাখা উপজাতিতে বিভক্ত যথা ঃ চাকমা, ডুইংনাক ও তঞ্চঙ্গ্যা। শতাব্দীকাল আগে ডুইংনাকেরা মূল সমাজ থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে চলে গিয়েছিলো। কয়েক বছর আগে তাদের কিছু লোক পুনরায় চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমায় ফিরৎ এসেছে। (সুত্র ঃ প্রভিন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪১০/১৯৪১)
3. The tribes consider themselve descendants of emigrants from Bihar who came over and settled in this parts in the days of the Arakanies kings.
(Ref : An account of Chittagong Hill Tracts. by S. H. Hutchinson, Page 89)

বাংলা ঃ এই উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহার বাসীদের বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখন্ডে আরাকানী রাজাদের শাসন কালে এসে আবাস গড়ে নিয়েছে। (সূত্র ঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ঃ এস. এইচ. হ্যাচিনসন, পৃঃ ৮৯)

৪। তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাদের অনেকের উপাধি ছিল শেখ, যা থেকে থেক বা স্যাক নামের উৎপত্তি হয়েছে।

(সূত্র ঃ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪, পৃঃ ২০১-২ কর্নেল ফেইর লিখিত প্রবন্ধ)

৫। চাকমারা মগ নারী ও মোগল সৈনিকদের মিলনজাত বংশধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকে মোগল ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনুগত হয়, এবং খোদ চাকমা প্রধানরাও মুসলমানী নাম ও খেতাব ধারণা করেন। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ফলে তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে, এবং হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়। (সূত্র ঃ সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ)

৬। চাকমারা আধাবাঙ্গালী তাদের পোষাক পরিচ্ছদ আর ভাষাটিও এক জাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধিসহ নামগুলো পর্যন্ত এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।

(সূত্র ঃ (১) মিঃ জীম বীম সেন কমিশনার চট্টগ্রাম এর চিঠি নং-২২৭ এইচ/তাং ৫/৯/১৮৭৯)

(২) চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ১১

৭। প্রচলিত মগ জনশ্রুতি ঃ কোন এক সময় চট্টগ্রামের জনৈক উজির আরাকান রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে এক শুদ্ধাচারী ফুঙ্গী, উজির সাহেবকে আহারের নিমন্ত্রণ দেন। খাবার দিতে দেরী হওয়ায় উজির সাহেব জনৈক সৈনিককে তার কারণ অনুসন্ধানে পাঠান। সৈনিকটি ফিরে এসে তাকে জানায় যে, ফুঙ্গী নিজের পা চুলাতে স্থাপন করেছেন ও তা থেকে আগুন জ্বলছে। এই সংবাদে উজির সাহেব রাগান্বিত হয়ে চলে যান। ইতোমধ্যে ফুঙ্গী খাদ্যাদিসহ এসে দেখেন উজির সাহেব ও তার সঙ্গীরা নেই। তাতে তিনি মনোক্ষুণ্ণ হয়ে অভিশাপ দেন। পরিশেষে উজির সাহেব সসৈন্যে পরাজিত ও বন্দী হোন এবং মগ রাজার অনুমতিক্রমে সসৈন্যে মগ মহিলাদের বিবাহ করে, সে দেশে অন্তরীণ হয়ে থাকেন। চাকমারা ঐ তাদেরই বংশধর। (সুত্র ঃ চাকমা জাতি, সতীশচন্দ্র ঘোষ পৃঃ ৫)

৮। প্রবল জনরব বিদ্যমান যে, চাকমা রাজা ধরম্যা বা ধারা মিয়ার সাথে কোন এক বিশিষ্ট মোগল সেনাপতির কন্যার বিবাহের সম্পর্ক ঘটে। এর ফলে চাকমা সমাজে মুসলমানী আচার ব্যবহার ইত্যাদি প্রবিষ্ট হয়। মুসলমান রাণীর গর্ভজাত বলে, তৎপুত্র মোগল্যা নামে পরিচিত হোন। ঐ সময় থেকেই চাকমা রাজবংশে খাঁ ও বিবি উপাধির প্রচলন শুরু হয়েছে। (সূত্র ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ৬৪)

৯। বার্মা সাম্রাজ্য তখন তিন দেশে বিভক্ত ছিলো, যার একটি ছিলো চাকমা রাজার অধীন। (সূত্র ঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস ঃ রাজা ভুবন মোহন রায়)।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল আওয়াল মহোদয় কুমার দেবাশীষ রায়কে গত ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭৭ ইং সনে একটি তরবারি প্রদানের চাকমা রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন।

(ক) রাজা নগর পরিদর্শন :

পুরাতন চাকমা রাজবাড়ি, রাজানগর, চট্টগ্রামের উত্তর রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত। রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম সড়কের রাণীর হাট থেকে আমি ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের কর্মকর্তা জনাব জাফরী হানাফী, একটি মোটর সাইকেলযোগে কাঁচা গ্রাম্য পথে অগ্রসর হই। সময় সম্ভবতঃ জুন বা জুলাই ১৯৯৩ সাল আমাদের যাত্রা পথের চতুর্দিকে বাঙ্গালী জনপদ, সমতল কৃষিক্ষেত্র ও বিচ্ছিন্ন উঁচু নীচু টিলার সমাবেশ। এলাকাটি আধা পাহাড়ী। ইছামতী নদীটিও একে বেঁকে দক্ষিণমুখী চলমান। আমরা উভয়ই এ পথে নতুন, তাই পথে পাওয়া যাত্রীদের জিজ্ঞাস করে, গন্তব্যের হদিস জেনে নিচ্ছি। পূর্বে অদূরে উত্তরে দক্ষিণে লম্বমান মানিকছড়ি পাহাড় শ্রেণী, হাতীর পিঠের মত উঁচু হয়ে দন্ডায়মান। ওপারে বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম। পাহাড়টিকে মনে হয় একটি উঁচু দুর্লঙঘ্য প্রাকৃতিক দেওয়াল। ওপারের বন ও পাহাড়ের রহস্যঘেরা দেশটিকে যেন পাহারা দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। এপারে সমতল ঘনবসতি পূর্ণ আবাদী অঞ্চলও তার বাসিন্দারা মিশ্র চেহারার বাঙ্গালী। মনে হয় তাদের পূর্বপুরুষেরা মাতৃ বা পিতৃ পক্ষে কেউ বাঙ্গালী ও কেউ মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাই গঠন ও গাত্র বর্ণ মিশ্র বৈচিত্র্য মন্ডিত। গোটা এলাকাটির নাম রাজানগর ইউনিয়ন। মাইল খানেক পর ক্ষুদ্র টিলা ও খাদে মিশ্রিত অঞ্চলের শুরু। তারই এক অংশের নাম ফুল বাগিচা। স্থানীয় মুরব্বী জনাব মৌলবী নুরুচ্ছফা জানালেন একদা অঞ্চলটি চাকমা রাজাদের প্রমোদ বাগিচা হিসেবে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ ছিলো। আজ ফুল বাগিচা নামটি মাত্র সে প্রাচীন প্রমোদ আয়োজনের স্মৃতি বহন করছে। রাণীর হাট, রাজানগর ও রাজারহাট সে যুগের চাকমা রাজা-রাণীদের স্মৃতিবাহী নাম। রাঙ্গুনিয়া নামটিও নাকি চাকমা রান্যা শব্দের অপভ্রংশ, যার অর্থ পরিত্যক্ত জুমভূমি। এলাকাটি পূর্বের পর্বতময় পাহাড়ী অঞ্চলের শেষ পশ্চিমাংশ। একদা এতদাঞ্চলে জুম চাষ সম্ভব ছিলো। এ ক্ষুদ্র টিলাময় আধাপাহাড়ী এলাকাটি দক্ষিণে কর্ণফুলি নদীতীর পর্যন্ত বেশ কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত। মৌলবী নুরুচ্ছফার কাছে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রের সন্ধান পেলাম ও তৎপর রাজারহাটের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। গ্রাম্য বাজার হলেও রাজারহাট বেশ বড়। বাজারে প্রবেশের মুখেই সড়কটির দু'পাশে দুটি বড় দীঘি। পশ্চিমে রাজবাড়ী। দু'দীঘির মাঝখানের চওড়া জায়গাটির উত্তর অংশ জুড়ে রাজা ভুবন মোহন উচ্চ বিদ্যালয়। মৌলবী নুরুচ্ছফা তার পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি। তার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষকের স্থলে সহকারী প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের সাথে দেখা করি। তাঁর কাছে আমাদের কাম্য তথ্যাদি না পেলেও কিছু তথ্য সূত্র, সাময়িক আপ্যায়ন ও একজন স্থানীয় গাইডের সহায়তা পাই, যাকে নিয়ে রাজবাড়ী এলাকায় অনুসন্ধান কাজ করা আমাদের পক্ষে সহজ হলো। লোকটি বয়সে তরুণ, তবে প্রাচীনকালের কথা-কাহিনী সম্বন্ধে বাপ দাদাদের সূত্রে কিছুটা ওয়াকিবহাল। আমরা জানতে চাই, রাণী কালিন্দি কর্তৃক রাজবাড়ী এলাকায় স্থাপিত যে সব মন্দির ও মসজিদ

ছিলো, সেসবের অবস্থান কোথায় ও হাল অবস্থা কি? প্রাচীনকালের পাকা ইমারতাদি সম্বন্ধেও আমরা খোঁজ নেই। কিন্তু লোকটি বয়সে তরুণ হওয়ায় এবং তার চেয়ে অধিক বয়স্ক বা বৃদ্ধ স্থানীয় অন্য লোকের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় আমরা হতাশই হই। তবু সে দেখাল পূর্বের দীঘির উত্তর পাড়ে একটি মসজিদ, যা বর্তমানে পুনর্নির্মিত। এটি রাজবাড়ী এলাকার একমাত্র মসজিদ। কিন্তু এর সাথে চাকমা জাতি নামীয় পুস্তক রচয়িতা বাবু সতিশ ঘোষের বর্ণনার অমিল দেখা যায়। তিনি লিখেছেন মসজিদটি, রাজবাড়ীর সামনেকার দীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। তাতে আজান ও নামাজ পড়ানোর জন্য খন্দকার নিযুক্ত হতেন। প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাজ শেষে খন্দকার মৌলবী ও কাজী প্রভৃতিকে আহবান করে, বাহিরের ঘরে ওয়াজ হতো এবং দুধের পায়েশ বা শিন্নিতে সমবেত মুসল্লিরা আপ্যায়িত হতেন। অনুরূপ নানা স্থানে অবস্থিত মসজিদ সমূহের সাহায্যার্থেও অর্থ কড়ি পাঠান হতো। *(দ্রষ্টব্য চাকমা জাতি পৃষ্ঠা ১১)*

সন্দেহ করা সত্ত্বেও আমরা মসজিদটি দেখে নিলাম। গাইড তরুণটির বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদটির প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় কোন এক দরবেশের লাশ সমাহিত আছে। দীঘি সংস্কারকালে কোন এক সময় একটি লাশ আবিষ্কৃত হয়। কোদালের আঘাতে যার কোন অঙ্গ কেটে যায়। তৎপর লোকজন ঐ লাশটি মসজিদ প্রাঙ্গণে পুনঃদাফন করেন। যার উপর বর্তমান অশ্বত্থ গাছটি বিদ্যামান। মনে হয় এই অংশটি আগে কবরস্থানভুক্ত ছিলো। এই সূত্রে এটা একটি মাজার। রাজবাড়ীর পূর্ব প্রান্তের প্রধান এই দীঘিটির পূর্বপাড়ের শেষ উত্তর অংশ হলো প্রাচীন কবরস্থান। তবে তাতে কোন সদ্য কবরের চিহ্ন নেই। এটা রাজাদের কবরস্থান হিসেবে সংরক্ষিত। পার্শ্ববর্তী খন্দকার পাড়ার মুসলমানেরাও এটা ব্যবহার করেন না। মনে হয় মসজিদ সংলগ্ন দীঘিটি হলো প্রাচীন দ্বিতীয় দীঘিটি পরে খননকৃত এবং মসজিদটি ও মন্দিরের আগে নির্মিত। রাজবাড়ী অঞ্চলটি ইছামতি নদীর বাঁকের ভিতর পূর্ব পাড়ের সমতল নিয়ে গঠিত। রাণীরহাট থেকে আগত কাঁচা সড়কটি সামনের দু'দীঘির মধ্যবর্তী চওড়া খালি জায়গাটি হয়ে হাটের উপর দিয়ে এগিয়ে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কের সাথে যুক্ত হয়েছে।

আমরা পশ্চিমের দীঘির উত্তর পার হয়ে মন্দির এলাকাটির দিকে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণায় মাটির দেওয়াল ও টিনের ছানিযুক্ত একটি বিধ্বস্ত ঘর। এটা মন্দিরের সেবায়েৎ ও দর্শণার্থীদের বিশ্রামাগার। তৎপর পশ্চিমে সর্ব উত্তরে পালি মন্দির নামের প্রথম পাকা ইমারতটি অবস্থিত। এ মন্দিরটিকে বর্তমান রাজা দেবাশীষ রায় কর্তৃক ১৯৮৬ সালে পালি টোলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন আকার ও ভঙ্গিতে গঠিত কিছু বৌদ্ধ মন্দির স্থাপিত আছে। মূল বৌদ্ধ মূর্তিটি অবয়বে বিরাট। এখানে শ্রীমতি মনোমোহনী রায়ের ব্যবহৃত একটি কারুকার্যময় খাট ও একটি ইজি চেয়ার রক্ষিত আছে। মন্দিরটি চৌকোণ ও আধা তীক্ষ্ণ চূড়া সম্বলিত। হিন্দু

মন্দিরের তীক্ষ্ণ চূড়ার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এটিতে পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়নি। দীঘির পশ্চিমের চওড়া প্রাঙ্গণ জুড়ে পর পর এক সারিতে চারটি মন্দির অভিন্ন নির্মাণ কৌশলে স্থাপিত। তবে উত্তর ও দক্ষিণের দুটি একই আকারের বৃহৎ উপাসনালয় এবং মাঝের দুটি আকারে ছোট। দুটি স্মৃতি মন্দিরের উত্তর পাশের প্রথমটি রাণী কালিন্দির স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজা ভুবন মোহন রায় কর্তৃক স্থাপিত এবং দ্বিতীয়টি, এ রাজবাড়ীরই ছোট বৌ শ্রীমতি মনোমোহিনী রায়ের, যিনি রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী, তথা রাজা ভুবন মোহন রায়ের সৎ মা ছিলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে রমণী মোহন রায় ও তার বংশধরেরা এই রাজানগরের পরিত্যক্ত রাজবাড়ি ও তার সম্পদ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও বর্তমান দখলকার। ১৮৭৩ খ্রীঃ সালে রাজা হরিশচন্দ্র রায় রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে এই রাজানগর ত্যাগ করায় এবং প্রথম পক্ষের ছেলে ভুবন মোহন রায় সর্দারীর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হওয়ায়, রাজা নগরের সম্পত্তি রমণী মোহন রায়ের ভাগে পড়ে। তিনি জীবদ্দশায় ছোট রাজা নামে খ্যাত ছিলেন।

স্মৃতি মন্দির দুটির ভিতরে বেদির উপর ছোট আকারের মূর্তি স্থাপিত আছে। প্রথমটির দরজা শীর্ষে সিমেন্টের আস্তরে নিম্নোক্ত বাংলা ভাষ্যটি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

এবার আমরা সারির চতুর্থ ও শেষ মন্দিরটিতে পৌঁছলাম। সেটি মুহামুনি মন্দির নামে রাণী কালিন্দি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। এটা ও পাকা চৌকোণ ও আধা তীক্ষ্ণ চূড়া সম্বলিত। এর ভিতর স্থাপিত আছে বিরাট অবয়বের এক বৌদ্ধ মূর্তি। এই মন্দিরেরই দরজা শীর্ষে লিখিত আছে রাণী কালিন্দির সেই ঐতিহাসিক ভাষ্য, যা চাকমা ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। এটা চাকমা সমাজের বাংলা ভাষা ও রচনা শৈলী ব্যবহারের অন্যতম প্রাথমিক' নিদর্শনও বটে। এই লিপিটি শিলালিপি নয়, দেওয়াল লিপি বলাই সঙ্গত। কারণ এটি আস্তরের উপর খোদাই করা, শীলের উপর নয়।

এই চিহ্ন স্থাপনের ১২ বছর আগে ১৮৫৭ খ্রীঃ সালে ব্রহ্ম দেশাগত সজ্ঝরাজ সারমেধ মহাস্থবির ও হারবাং এর গুণামেজু ভিক্ষুর কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে রাণী কালিন্দি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত হোন। (সূত্র : চাকমা জাতি পৃ: ১১২ এবং বাবু সুগত চামকা লিখিত প্রবন্ধ : চাকমা বর্ণমালার ইতিবৃত্তঃ উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জুন ১৯৮২ ইং রাঙ্গামাটি) তবে অন্য তথ্যে ব্রহ্মদেশীয় ঐ মহাস্থবিরের এদেশে আগমনকাল পরবর্তী ষাটের দশকে বলে বর্ণিত হয়েছে, যদ্দরুন রাণীর ধর্মান্তর গ্রহণের সময় ও গুরু গ্রহণের তারিখেও ভিন্নতা ঘটা সম্ভব।

এখানে স্মর্তব্য যে, রাজা ধরম বখ্‌শ খাঁ ও তার পিতা জব্বার খাঁর সীলমোহরে দেবী কালি তারা ও নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাতে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি

তাদের অনুরাগ প্রকাশিত হয়। রাজা ভুবন মোহনের স্মৃতি কথায় রানী কালিন্দির হিন্দু ধর্মানুরাগ স্বীকৃত। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আগে রাণী কালিন্দির পক্ষে স্বামী ও শ্বশুরের ধর্মানুসারী থাকাই সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে স্বামী ও শ্বশুরের মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণ এবং খোদ রাণী কালিন্দি কর্তৃক বিবি উপাধি ব্যবহার, মসজিদ স্থাপন ও ইসলাম ধর্মীয় সেবা অনুসরণ, সঙ্গতি বিহীন কাজ। মনে হয় তাদের সবাই সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মিশ্র ধর্মাচারের ঐ ঐতিহ্যকে শেষ বয়সে রাণী পরিত্যাগ করে নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধে পরিণত হোন। তাঁর ঐ বৌদ্ধানুরাগকে অনুসরণ করে চাকমা সমাজও তখন থেকে বৌদ্ধে পরিণত হয়েছেন কিনা তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

দীঘির পশ্চিম প্রাঙ্গণের মন্দিরের পরবর্তী দক্ষিণাংশ খালি সমতল। এখানে কোন ইমারতাদির চিহ্ন নেই। কথিত মসজিদটির এই এলাকায় থাকা ও সন্দেহজনক। কারণ এক পরিবেশে মন্দির ও মসজিদের অবস্থান পূজা আর এবাদতের ভিন্নতার গুণেই অপ্রত্যাশিত। বিশেষতঃ মুসলিম প্রধান এই অঞ্চলটিতে মসজিদের পাশে মন্দির এবং নামাজের পাশে পূজা অর্চনা সহনীয় হতে পারে না। সুতরাং কথিত মসজিদটির পূর্বের দীঘির পাড়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মান্য। দ্বিতীয় দীঘিটি হয়তো পরে খননকৃত। তবে এ ব্যাপারে আরো অনুসন্ধান আবশ্যক।

এতদাঞ্চলের সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি এবং রাজবাড়ীর সামনের স্কুলটির প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বাবু ব্রজেন্দ্র লাল পালকে জিজ্ঞাস করে জানা গেলো যে, পূর্বের দীঘির পাড়ের মসজিদটি আসলে গোলাম মেহদির মসজিদ নামে খ্যাত। আগে তা মাটির দেওয়ালে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সম্প্রতি পাকা হয়েছে। এই মসজিদটিকেই রাজাদের মসজিদ বলে। গোলাম মেহদি হয়তো রাজ পরিবারের গুরু বা কোন সদস্য ছিলেন।

অতঃপর আমরা পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত রাজমহলের অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হই। দীঘিটির দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় প্রথমেই একটি লম্বা ইটের গাঁথুনী ও টিনের ছানিযুক্ত ঘর অবস্থিত। এটা কাছারী ঘর নামে খ্যাত, যা বর্তমানে একটি করাত কলে পরিণত হয়েছে।

ঘরটির পিছনে দীঘির দক্ষিণ পশ্চিমে সোজা পশ্চিমমুখী পথের দু'পাশে ও সামনে অন্দর মহলের বিস্তীর্ণ এলাকা। দীঘির সোজা পশ্চিমে উত্তর অংশে কিছু ব্যবধানে একটি ছোট মহলী-পুকুর আছে। ঠিক মাঝামাঝি এলাকায় বাঁশ গাছ ও টিনের ছানিযুক্ত পুরাতন জীর্ণ, কিন্তু বেশ বড় একটি আবাসগৃহ অবস্থিত, যে ঘরটির বাসিন্দা হলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতৃপক্ষের জনৈক বংশধর। ঘরটির মালিক অনুপস্থিত থাকায়, তার কাছে দ্রষ্টব্য পুরাতন কোন নিদর্শনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো না। এই ঘরেরই দক্ষিণ অংশে রাজবাড়ীর মূল ইমারতটি পরিত্যক্ত আর আধা বিধ্বস্ত অবস্থায় দন্ডায়মান।

দালানটি ইটের দ্বারা প্রস্তুত দ্বিতল ও প্রাসাদোপম। পশ্চিম অংশের ছাদ ও দ্বিতল অংশ আংশিক ধ্বসে গেছে। নীচের দেওয়ালগুলো অক্ষত আছে। দালানটির উপরে ও নীচে ছোট বড় গাছ ও তা লতা-পাতা ও জঙ্গলে ঢাকা; যা সাপ বিচ্ছুর নিরাপদ আশ্রয় হওয়ার যোগ্য। ভয়ে ভিতরে যাওয়া ও পরীক্ষা করা সম্ভব হলো না। নিরাপদ দূর থেকে বাঁশ গাছ ও লতা পাতার ফাঁক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হলাম।

ধ্বংসাবশেষ হলেও এটি বিরাটত্বে ও বাহ্যিক অবয়বে প্রাসাদেরই পরিচয় বহন করে। অযত্নে অবহেলায় দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকার কারণে, বাড়ীটি দীন হীন বিধ্বস্ত। এভাবে থাকলে অচিরেই এটি পরিপূর্ণ ধ্বংসস্তূপের রূপ নিবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দালানটিতে মোগলাই নির্মাণ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। ইটগুলো চুন সুরকিতে গাঁথা এবং দেয়াল ও দরজা জানালায় গোল খিলান পদ্ধতি অবলম্বিত। জঙ্গলে আবৃত থাকার কারণে ছাদের গঠন প্রণালী অবলোকন করা গেলো না। সাধারণ অবয়ব আর অবস্থিতির দ্বারা মনে হলো, রাজ াড়ীটি দক্ষিণমুখী, যার সামনে ইছামতি নদী প্রবাহিত। নদীর পাড় ধরে পূর্বমুখী সংযোগ পথ; দীঘির পাড়ের মূল সড়কটির সাথে যুক্ত হয়েছে।

এই রাজ মহলটি তার বিশাল ও জৌলুশময় অবয়ব, বিস্তৃত পার্শ্ব পরিবেশ, আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের নিদর্শনাদিসহ অতীত গৌরবের সমৃদ্ধ স্মৃতি বহন করে। এর মালিকদের উঁচু সামাজিক মর্যাদা, আভিজাত্য, বিশাল সম্পদ সম্পত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী থাকা এতদ্বারা নিশ্চিত হয়।

দালানটিতে ব্যবহৃত ইটগুলো হাল আমলের মত চওড়া ও বড় হওয়ায় এর নির্মাণকাল বৃটিশ আমল বলেই নির্ণীত হয়। মোগল আমলের ইট ছিলো পাতলা ও ছোট। নির্মাণ কৌশলে খিলান পদ্ধতি আর চুন-সুরকি ব্যবহৃত হওয়ায় অনুমিত হয় মোগল আমলের কাছাকাছি সময়কালেই এটি নির্মিত। ইতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, চাকমা প্রধান শের দৌলৎ খাঁ ১৭৭৬ খ্রীঃ সালে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁর ঐ বিদ্রোহে কিছু বাঙ্গালী আর কুকি লোকজন শরিক ছিলো। রাজা জান বখশ খাঁও পিতার সূচিত ঐ বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু জনগণের দুঃখ দুর্দশায় মুষড়ে পড়ে ১৭৮৭ খ্রীঃ সালে আত্মসমর্পণ করেন। তৎপর তিনি পাহাড়ের পরিবর্তে রাঙ্গুনিয়ার এই অঞ্চলকেই বাসস্থান হিসাবে বেছে নেন। আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে রাজবাড়ি এবং রাজাদের নামে চিহ্নিত বিভিন্ন হাট-বাজার ও জনপদ। সে থেকেই রাজার হাট, রাজানগর, রাণীর হাট ও রাজাদের বিনোদন কেন্দ্র ফুল বাগিচা ইত্যাদির নামকরণ ও পরিচিতির উদ্ভব।

আমার মনে হয় রাজাদের রাঙ্গামাটি স্থানান্তর গ্রহণের পক্ষে যেমন সরকারী চাপ কার্যকর ছিলো, তেমনি তাদের রাঙ্গুনিয়ার বসবাসটিও ছিলো বৃটিশ আরোপিত বাধ্যবাধকতার ফল। রাজাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিলো উদ্দেশ্য। এ কারণেই কোদালা উপত্যকায় অবস্থিত শুকবিলাস ও রাজভিলার পুরাতন রাজবাড়ি ও কাছারীগুলো পরিত্যক্ত হয়, যে অঞ্চলগুলো এখনো চাকমা রাজ পুরুষদের স্মৃতিতে ধন্য।

বিদ্যুৎ উন্নয়নের প্রয়োজনে রাঙ্গামাটির তৃতীয় রাজবাড়িটিও এখন কর্ণফুলী হ্রদের গভীর জলে বিলীন হয়ে গেছে। চতুর্থ রাজবাড়িটি রাঙ্গামাটির একাংশে পুনর্নির্মিত হলেও, সেই রাজকীয় শান শওকত আর অর্থাগম এখন অব্যাহত নেই। জুমিয়া প্রথা আর জুম কৃষির অভাবে এখন আর এই রাজবাড়িতে লোক সমাবেশ ও পুন্যাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। দরবারও বসে না। এখন রাজবাড়ীগুলোর সবটাই মৃতপুরী এবং তার উত্তরাধিকারীরা ক্ষমতাহীন।

এখন চাকমা সমাজে রাজারা অবহেলিত। তবে এটা ভেবে দেখার অবকাশ আছে যে, এই রাজাদের গুণেই চাকমা সমাজের স্বতন্ত্র পরিচিতি ও মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। অতীত থেকে দলপতি নিয়ন্ত্রিত আর ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণেই তারা বিশেষ সমাজ ও সম্প্রদায় হিসাবে মান্য। তাদের বিশেষ উপজাতীয় পরিচিতি ও প্রভাবের ভিত্তি হলো দীর্ঘ রাজকীয় ঐতিহ্য। সর্দারী নিয়ন্ত্রণই তাদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি। নতুবা পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীর মত তাদেরও বিলীন হয়ে যাওয়া ছিলো অবধারিত। এতদাঞ্চলে মোগল, পাঠান, তুর্কি, ফার্সী ও হাবসীদের প্রভাব ও সংখ্যা কম ছিলো না। কিন্তু রাজনৈতিক ও সমাজগত ঐক্য, শক্তি ও প্রভাবের অভাবে তারা আজ পরিচয়হীন বিলীন। স্বধর্মীয় বৃহৎ সমাজ ও সম্প্রদায়গুলো তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। চাকমা সমাজকে অনুরূপ হারিয়ে যাওয়া থেকে তাদের রাজনেতৃত্বই বাঁচিয়েছে। এখন শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুণে নেতৃত্বের বিস্তার ঘটেছে। গণতান্ত্রিক ক্ষমতাবাদ ও আধুনিক জীবনধারায় উপজাতিরাও উদ্বুদ্ধ। কায়েমী ও খান্দানী নেতৃত্ব এখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত, স্বচ্ছল, ক্ষমতালিপ্সুদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই নেতৃত্ব এখন আর অভিজাত বংশানুসারী ও নির্বিরোধ নেই। শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থ এখন আর রাজবাড়ীতে আবদ্ধ নয়। প্রজাদের অনেকেই এখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং রাজনেতৃত্ব এখন অতীতের ঐতিহ্যই মাত্র। রাজ বংশধরেরা এখন অতীতের সুখকর ও গৌরবময় স্মৃতি রোমন্থণেই সান্ত্বনা পেতে বাধ্য। গণতন্ত্র ও আধুনিকতা উপজাতিদেরকেও উচ্চাভিলাষীতে পরিণত করেছে। তাদের কাছে এখন রাজঐতিহ্য মানে পশ্চাদপদতা ও আদিমতা। রাজ আধিপত্যকে মর্যাদাপূর্ণ অতীত ঐতিহ্য বলে মানা হলেও এখন তা অবহেলিত। সবারই চিন্তা-চেতনা ভোগ-বিলাস ও নেতৃত্ব প্রয়াসী। বাস্তব সুখ সুবিধা ও স্বার্থই ব্যক্তি চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এখন উপজাতীয়তার দাবী রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণের সূত্র মাত্র। একারণেই প্রকৃত ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। অবশ্য এই অতিরঞ্জন সর্বপ্রথম রাজ পরিবার থেকেই শুরু হয়েছে। রাজা ভুবন মোহন রায় দীর্ঘ কৌলিন্য রচনার প্রয়াস হিসাবে কিছু আজগুবী কথা কাহিনী চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেন। তাতে রং চড়িয়ে আরো ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলেন বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান। এই প্রয়াসেরই শেষ চেষ্টা হিসাবে বাবু সুগত চাকমা তার বিভিন্ন পুস্তক ও রচনায় চাকমা অতীতকে স্বাধীন রাজ্যাধিকারে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যা তাদের প্রামাণ্য অতীত তথ্য নিদর্শনাদি কোন মতেই সমর্থন করে না। এতদসত্ত্বেও চাকমা রাজকৌলিন্য অস্বীকারযোগ্য নয়।

রাজানগর রাজবাড়ির অবস্থান, মুসলিম প্রধান এলাকায় নির্ণীত হওয়াকে কার্যকারণহীন বলা যায় না। তদুপরী চট্টগ্রাম সদর ও পর্বতাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলকে ত্যাগ করে, ঐ নদীর উত্তর তীরের অন্যতম উপনদী ইছামতির ৫/৬ মাইল অভ্যন্তরের রাজানগর অঞ্চলকে রাজবাড়ীর জন্য বেছে নেওয়াটাও কার্যকারণহীন নয়। যদি আশপাশের টিলাময় আধা পাহাড়ী অঞ্চলে জুম চাষের সুবিধাকে কারণ হিসাবে ধরে নেয়া যায়, তাহলেও বলা যায়, এর চেয়ে ভাল জুম ভূমি অন্যত্র পাওয়া সম্ভব ছিলো। শিলক কর্ণফুলীরই অন্যতম দক্ষিণ-পূর্বমুখী উপনদী, যার কয়েক মাইল ভিতরে অবস্থিত উপত্যকায়, রাজভিলা ও শুক বিলাস নামীয় জায়গায় রাজবাড়ী ও রাজ দপ্তর বিদ্যমান ছিলো। অবস্থানগতভাবে শিলক উপত্যকা আর ইছামতি উপত্যকা কর্ণফুলীর দুই বিপরীত তীরে পাশাপাশি অবস্থিত। দূরত্বের বিচারেও দুই রাজবাড়ী অঞ্চল ১০/১২ মাইলের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত নয়। তবে ইছামতি অঞ্চলটি সুলতানী আমল থেকেই মুসলিম অধ্যুষিত। ঈসা খাঁ মসনদে আলা ও তাঁর সহযোগীরা মোগলদের দ্বারা পশ্চাত-ধাবিত হয়ে সৈন্যসামন্ত সহ উক্ত এলাকায় বহুবার আত্মগোপন করেছিলেন এবং তা ছিলো তাদের শক্তি সঞ্চয়ের বিশ্রামস্থল। তাদের সেই অবস্থানের স্মৃতি ধারণ করেই ইছামতি, ঈসাখালী ইত্যাদি নাম প্রচলিত। পরে মোগল আমলেও এতদাঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাজার হাটের নিকটকার মোগলের হাট তার স্মৃতিবাহী স্থান। সম্ভবতঃ পাঠান ও মোগল বংশীয় কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন, যাদের সাথে চাকমা রাজ পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো। বাসস্থান নির্বাচনে সেই আত্মীয়দের নৈকট্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় মুসলিম সম্ভ্রান্তদের সাথে চাকমা রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কথা এই লেখকের নিজস্ব অনুমান মাত্র নয়, এটা বিভিন্নভাবে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত। যথা :

১) রাজা ভুবন মোহন রায়, নিজ পুস্তিকা চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে স্বীয় উর্ধ্বপুরুষদের যে তালিকা প্রদান করেছেন, সে তালিকায় দেখা যায়, তার অনেক উর্ধ্ব পুরুষ খাঁটি মুসলিম নাম ও খেতাবের অধিকারী, যে তালিকার অন্যতম নাম হলো মোগল্যা। যা মোগল নামের স্থানীয় বিকৃতি। একাধিক সূত্রে স্বীকার করা হয়, তার মা ছিলেন একজন মোগল কন্যা।

২) একাধিক সূত্রে এটা সমর্থিত হয়েছে যে, অতীতে চাকমা মহিলাদের কাফন পরিয়ে কবর দেয়া হতো। তাদের বিবাহে মোহরানা সাব্যস্ত হতো, যা চাকমা ভাষায় এখন দাবা নামে খ্যাত, এবং সম্ভ্রান্ত চাকমা মহিলারা বিবি সম্বোধিত হতেন ও পর্দা মান্যতায় অভ্যস্ত ছিলেন। এ কারণেই চাকমা ভাষায় ছদর শব্দটি প্রচলিত, যা ইসলামী পরিভাষা 'ছতর' এর অপভ্রংশ, যার অর্থ লজ্জাস্থান। এ থেকে ছতর ঢাকা বা পর্দা করা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৩) চাকমা রাজা শের দৌলৎ খাঁ ও তার পুত্র জান বখশ খাঁর বিদ্রোহী তৎপরতার মদদগার হিসেবে জনৈক মুন গাজী ও তার কিছু মুসলিম সহযোগীদের কথা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ঐ লোকগুলো বিদ্রোহী চাকমা রাজ পক্ষের মিত্র তো বটেই, তাদের আত্মীয় হওয়ার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বার্থ ছাড়া তাদের পক্ষে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের দুঃসাহস করা সম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। সরকারের উপর তাদের অসন্তুষ্ট হবার অন্য কোন কারণও কোন বিবরণে ব্যক্ত হয়নি। এই সহযোগিতাকে কার্যকারণ হীন বা দুষ্কর্ম বলার পক্ষেও কোন যুক্তি নেই। সুতরাং মুনগাজীদের ঐ মদদকে ঘনিষ্ট আত্মীয়দের প্রতি, বিপদক্ষণের সহায়তা ভাবা যেতে পারে।

৪) চাকমা সর্দারদের দরবারী আচার-আচরণ ও আড়ম্বর মোগলদের হুবহু অনুকরণ বলা যায়। পাগড়ী, শেরওয়ানী, পায়জামা, নাগারা আর তলোয়ার শোভিত চাকমা রাজপুরুষেরা যখন দরবারে পদার্পণ করেন, তখন সমবেত প্রজা সাধারণ হুজুরের উদ্দেশ্যে কুর্ণিশ ও নজরানা আরজ করেন এবং অন্দরমহলে রাজ মহিষী বিবি মর্যাদায় সালাম পেয়ে থাকেন। দরবারটিও সানাই সুহরত সহকারে বসে ও ভাঙ্গে। এটা মোগলাই দরবারেরই মহড়া। সুতরাং ভাবা সঙ্গত যে, মোগলাই আত্মীয়তার সূত্রেই উক্ত অনুষ্ঠানাদি চাকমা রাজমহলে সংক্রমিত।

৫) চাকমা ভাষাটিও চট্টগ্রামী মুসলিম সামাজিক ভাষার জমজ। এতে আরবী ফার্সি ও ইসলামী পারিভাষিক শব্দ সংখ্যায় প্রচুর। খোদ মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এটা রপ্ত করা সম্ভব নয়। বিস্ময়করভাবে ভাষাটি পৌত্তলিকতা মুক্ত। তাদের অভিধানে ঈশ্বর শব্দ নেই, বরং দুঃখ ও ক্ষোভে সৃষ্টিকর্তাকে খোদা বলেই তাদের স্মরণ করতে দেখা যায়।

৬) রাজা শের জব্বার খাঁর সীলমোহরে 'আল্লাহু রাব্বি' খোদাই করা থাকায় ঐ বাক্যটির দ্বারা তাদের তখনকার পারিবারিক ধর্ম ইসলাম বলেই নির্ণীত হয়। রাজানগর রাজবাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান এবং মসজিদটিও তাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার স্মারক।

৭) মসজিদ প্রাঙ্গণের মাজারে সম্ভবতঃ কোন চাকমা রাজপুরুষই সমাহিত আছেন।

(খ) রাজভিলা পরিদর্শন

এতদাঞ্চলীয়, চাকমা ইতিহাসের সাথে শিলক নদী উপত্যকার পদুয়া অঞ্চলটি জড়িত। কর্ণফুলী নদীর পূর্বাগত প্রথম উল্লেখযোগ্য উপনদী হলো শিলক। এটি দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়াকে ভেদ করে কর্ণফুলীতে পতিত। তার উৎসস্থল হলো পূর্ব সীমান্তের পাহাড় শ্রেণী। ঝংরা এর অন্যতম খাল বা ছড়া। মোহনার কয়েক মাইল ভিতরের উপত্যকা অঞ্চলটির নাম পদুয়া। এখনকার মত অতীতেও বাঙ্গালী অধ্যুষিত আধা পাহাড়ী এই

এলাকাটি পদুয়া নামেই অভিহিত হতো। চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসক জুলকদর খান, এতদাঞ্চলীয় প্রথম চাকমা সর্দার শের মস্ত খাঁকে কিছু অনাবাদী পাহাড় বন্দোবস্তি দান করেন। ঐ বন্দোবস্তিতে পদুয়া নামের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, এলাকাটি এ নামীয় প্রাচীন আবাদী অঞ্চলই ছিলো। এই শিলকেরেই অন্যতম ছড়া হলো বাঙ্গাল হাল্যা। নামটি অর্থপূর্ণ ও বিকৃত। আসলে এটি ছিলো বাঙ্গাল খাল বা খালি। তা থেকে বিকৃতির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছে বাঙ্গাল হ্যাল্যা ও বর্তমানে মঘী উচ্চারণে বাঙ্গাল্লা। এই নামটাই প্রমাণ এতদাঞ্চল বাঙ্গালী অধ্যুষিত প্রাচীন আবাদী এলাকা। স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ চাকমারা বাঙ্গালীদের সম্বোধন করে বাঙ্গাল নামে। হয়তো শের মস্ত খাঁর অনুসারী চাকমারাই এলাকাটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত বলে, এ নামটির প্রয়োগ করেছে এবং এলাকাটি অদ্যাবদি তা-ই পরিচিত আছে।

শের মস্ত খাঁ চাকমা সমাজে এতদাঞ্চলীয় আদি রাজা নামে খ্যাত। চাকমা লোকগীতিতে তার এই নামটি স্বীকৃত, যথাঃ

"আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ি, তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।"

চাকমা রাণী কালিন্দি, রাজা নগর বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে লিখিত আকারেও স্বীকার করেছেনঃ শের মস্ত খাঁই, এতদাঞ্চলীয় চাকমাদের আদি রাজা।

অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, স্বীয় গবেষণা পত্রঃ রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুলকদর খানের দ্বারা চাকমা সর্দার শের মস্ত খাঁ ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে পদুয়ায় পুনর্বাসিত হোন।

বর্ণিত এই তিন সূত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এতদাঞ্চলে শের মস্ত খাঁ ও কিছু চাকমার প্রথম আগমন ও বসবাসকাল ঐ ১৭৩৭ সালই। তৎপূর্বে তাদের বাসস্থান ছিলো আরাকানভুক্ত রোসাং অঞ্চল এবং তখনো চাকমাদের প্রধান বা মূল অংশ, বাংলাদেশে স্থানান্তর গ্রহণ করে নি। পরবর্তী চাকমা সর্দার শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীলমোহরের ভাষাই প্রমাণ যে, তার জীবৎকাল পর্যন্ত মূল চাকমা জনগোষ্ঠী ও তাদের আনুষ্ঠানিক সর্দারের সদর দপ্তর আরাকানভুক্ত রোসাং অঞ্চলেই অবস্থিত ছিলো। আরবী বর্ণ ও ভাষায় খুদিত ঐ সীলমোহরের ভাষ্যটি হলোঃ রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, শের জব্বার খান, ১১১১ মঘী। সন হিসাবে এ সংখ্যাটিকে ১৭৪৯ খ্রীঃ ধরে, বলা যায় এটি তার সর্দারীর শুরু কাল। পরবর্তী সর্দার নুরুল্লা খাঁর সীলমোহর সূত্রে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শের জব্বার খাঁর কাল ১৭৬৫ খ্রীঃ। বস্তুতঃ স্থানীয় ইতিহাস সূত্রটিও বলেঃ শের জব্বার খানই নিঃসন্তান শের মস্ত খাঁর শেষ মৃত্যুর পর ১৭৫৮ খ্রীঃ সালে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হোন। এ থেকে সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যায়, মোগল আমলের শেষ ও বৃটিশ ঔপনিবেসিক আমলের শুরু কালেই এতদাঞ্চলে ব্যাপকহারে চাকমা আগমনের ঘটনার শুরু। পরবর্তী ১৭৮৪/৮৫ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান

দখল ও জনসাধারণের উপর ব্যাপক উৎপীড়ন, তথাকার দেশ ত্যাগীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। যাদের ভিতর চাকমা, মগ, লুসাই, মুরুং ইত্যাদি শরণার্থী ছিলো। ১৮১৮ সালেও একদল তঞ্চঙ্গ্যার আগমন ও আশ্রয় লাভ ঘটে। এই শরণার্থী সমস্যারই পরিণতি হলো ১৮২৪ সালে অনুষ্ঠিত বৃটিশ-বার্মা যুদ্ধ, এবং ভারতের অন্যতম প্রদেশ রূপে আরাকানের অন্তর্ভুক্তি। সুতরাং চাকমা মগ মুরং ইত্যাদি অবাঙ্গালীরা এতদাঞ্চলের আদিবাসী নয়, বৃটিশ আমলে গ্রহণকৃত বহিরাগত অভিবাসী।

শের মস্ত খাঁর এ দেশীয় আদি আবাসভূমি পদুয়া ও তার আশপাশকে সরে জমিনে দেখা ও সে আমলের স্মৃতি সন্ধানের উদ্দেশ্যে আমি গত ১১ই অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় রওয়ানা হই।

চন্দ্রঘোনার রায়খালি বাজার থেকে সঙ্গী হলেনঃ আমার এক শুভাকাঙ্খী ও আপনজন জনাব আংগনি এবং মতিপাড়া থেকে পুত্র প্রতিম কালামং। তারা উভয়ই পদুয়া ও তার আশপাশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। পথে দেখা হয়ে গেলো পদুয়ারই এক সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা মৌলভী আবুল হোসেনের সাথে। তিনি তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেনঃ এ অঞ্চলের অশীতিপর বৃদ্ধ ডাক্তার জনাব আং জব্বার যিনি তার শ্রদ্ধেয় পিতা, এতদাঞ্চলের অতীত স্মৃতির সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই অপ্রত্যাশিত সংযোগে আমি আনন্দিতই হলাম। বাঙ্গাল হাল্যা থেকে হাটা পথে টিলা চুড়া জমি, চড়াই উৎরাই, দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে পৌছলাম শুক বিলাস পাড়া নামে খ্যাত ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে। দেখা হলো তার সাথে। শুনলাম অনেক কথা কাহিনী।

শের মস্ত খাঁর পোষ্যপুত্র হলেনঃ শুকদেব রায়। আগে বর্ণিত চাকমা লোকগীতিতে তিনি উল্লেখিত হয়েছেন। পূরাণ কথা কাহিনীর মাধ্যমে জানা যায় শের মস্ত খাঁকে প্রদত্ত বন্দোবস্তিটির নাম ছিলো তরফে শুকদেব রায়। তার একটি সীলমোহর আছে। তদনুযায়ী তিনি রাজা নন, জমিদার। লোকগীতিটিও তার জমিদার হওয়ার সমর্থক। ঐ সীলমোহরের সময়কাল হলো ১১১৫ বা ১১২০। মঘী পঞ্জিকা ধরে তার সময়কাল দাঁড়ায় ১৭৫৩ বা ১৭৫৮ খ্রীঃ সাল। তবে অধ্যাপক আলমগীরের প্রদত্ত তথ্য মতে তিনি স্বীয় পালক পিতার জীবদ্দশায় ১৭৫৮ খ্রীঃ সালেই মারা গেছেন। ঐ শুকদেব রায়েরই স্মৃতিবাহী এই শুক বিলাস। জব্বার সাহেব জানালেন, এখান থেকে মাইল দেড়েক পশ্চিমে অবস্থিত রাজারহাট ও তার পার্শ্ববর্তী সেগুন বাগিচাটি, চাকমা রাজাদের স্মৃতিবাহী রাজবাড়ী এলাকা। এখন প্রাচীন কোন ইমারতের চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তবে প্রাচীন ধনলোভী কেউ কেউ কখনো সখনো এসে ঐ এলাকায় খোড়াখুড়ি করে। তাতে প্রাচীন কালের ইট সুরকি দৃষ্ট হয়। এছাড়া সেকালের স্মৃতি হিসাবে একটি মজা পুকুর সেগুন বাগিচাটির দক্ষিণ পাশে এখনো টিকে আছে। শিলক নদীটি তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত। এছাড়া কোন স্মৃতি চিহ্ন দ্রষ্টব্য নয়। হেটে হেটে এলাকাটি দেখে নিলাম।

এখানে কোন অবাঙ্গালীর বসবাস নেই।

চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়

এই এলাকাটি রাণী কালিন্দি রোড নামীয় একটি কাঁচা সড়কের দ্বারা পূর্বের রাজভিলা ও পশ্চিমের শিলক মুখের সাথে সংযুক্ত। উভয় স্থানের দূরত্ব সম্ভবতঃ ১০/১২ মাইল। মাঝামাঝি রাজার হাটের অবস্থান।

নামের সাদৃশ্যে মনে হয় আরো ১০/১৫ মাইল দূরবর্তী পূর্বের রাজস্থলী পর্যন্ত রাজাদের সম্পত্তির বিস্তৃতি ছিলো, অথবা সে পর্যন্ত চাকমা বসতি গড়ে উঠেছিলো।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অতিরিক্ত শের মস্ত খাঁকে পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুম খাজনা আদায়ের তহসিলদারী দেওয়া হয়েছিলো। তাতে কুকি ইত্যাদি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সীলমোহর অনুযায়ী দেখা যায়, ১৭৪০ খ্রীঃ সালে চাকমা সর্দার হলেন সোনা বি নামীয় জনৈকা মহিলা। তৎপরবর্তী সর্দার শের জব্বার খান ১৭৪৯ খ্রীঃ তৎপর নুরুল্লাহ খান ১৭৬৫ খ্রীঃ অতঃপর ফতেহ খান ১৭৭১ খ্রীঃ এবং তারপর শের দৌলৎ খান ১৭৭৬ খ্রীঃ সাল। এই শের দৌলৎ খান ও তদীয় জামাতা রনু খানই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং তাদের সহযোগী হোন মুন গাজী ও তার দল, এবং তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জুমজীবী কুকিরা।

আমার বর্ণনায় মুন গাজির কথা শুনে উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তার সাহেব ও তার ছেলে। বললেনঃ আমরাই সেই গাজিদের আওলাদ। তাদের হাতে ঐ প্রাচীন আমলের দলিল আছে। যে দলিলটি ঐ প্রাচীন ইতিহাসের পুষ্টি যোগায়।

বৃটিশরা স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এ কারণে মুন গাজিরা তাদের দ্বারা ডাকাত রূপে বর্ণিত হয়েছেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাকামী জঙ্গীরা আখ্যায়িত হয়েছেন বিদ্রোহী রূপে।

শের দৌলৎ খাঁ, রনু খাঁ ও মুন গাজিদের ঐ বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র কার্যক্রম ছিলো সারা পূর্বভারত ব্যাপ্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ। তখন সারা বাংলা ও বিহার জুড়ে ফকির ও সন্যাসীদের বৃটিশ তাড়াও আন্দোলন ছিলো জোরদার। ঐ একই সময়ে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে বৃটিশ খেদাও যুদ্ধ, স্বতন্ত্র কিছু ছিলো না। তখন ঐ ত্রয়ী যোদ্ধাচক্র নিজস্ব কোন স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণাও দেননি। বরং শের দৌলৎ খাঁর পুত্র, অন্যতম স্বাধীনতা যোদ্ধা ও পরবর্তী চাকমা সর্দার জান বখশ খান, নিজেকে মহারাজ বা জমিদার ঘোষণা করে, সীলমোহর ব্যবহার করেছেন। এই জান বখশ খানই ১৭৮৬/৮৭ সালে ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে, নিজ জমিদারী ও মর্যাদা রক্ষায় আপোষ রফা করেন। কিন্তু জমিদারী ও মর্যাদা রক্ষা পেলেও, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাকে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে স্থানান্তর গ্রহণে বাধ্য করেন। কারণ পদুয়া হলো পূর্বের অরাজক পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ। যেখান থেকে বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ।

১৭৩৭ থেকে ৮৭ এই পঞ্চাশ বছরকালের চাকমা সদর দপ্তর হলো পদুয়াস্থিত শুক বিলাস অথবা রাজ ভিলা। সম্ভবতঃ শুক বিলাস ছিলো জমিদারী সংক্রান্ত কাছারী বাড়ী, এবং রাজভিলা রাজাদের আবাসস্থল। রাণী কালিন্দি সড়কের মাঝামাঝি শুক বিলাস, আর শেষ পূর্ব প্রান্তে ঝংকা খালের পারে রাজভিলা।

সদর দপ্তর ও রাজবাড়ি উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে স্থানান্তরিত হলেও, উভয়ের দূরত্ব ১০/১৫ মাইলের বেশী নয়। শিলক নদীর বিপরীতে কর্ণফুলীর উত্তরমূখী উপনদী ইসামতি পারেই, মাত্র ৪/৫ মাইল ভিতরে রাজানগর অবস্থিত।

পদুয়ার সড়কটি রাণী কালিন্দির স্মৃতির স্মারক। তিনি জান বখশ খাঁর নাতি ধরম বখশ খাঁর পত্নি ও সাধারণ ঘরের মেয়ে। তবে অরাজবংশীয় মহিলা হলেও তিনি চাকমা সমাজে বিপুলভাবে কীর্তিত। এই সড়ক নির্মাণে তার অবদান থাকা সম্ভব।

চাকমা প্রধানদের কোন ভিত্তিতে রাজা বলা হয়ে থাকে, তা পরিষ্কার নয়। আসলে তো তারা এতদাঞ্চলের কোথাও স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ভূপতি ছিলেন না। তাদের ক্ষমতার স্মারকরূপী কয়েকটি প্রাচীন সীলমোহর এ কথাই প্রমাণ করে যে তারা ছিলেন চাকমা নামীয় জনগোষ্ঠীর দলপতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে করদ সামন্ত। স্বাধীন রাজত্ব ও রাজ্যের অধিকারী হলে, মুদ্রা ও বৈদেশিক বা আন্তঃরাজ্য স্বীকৃতির অধিকারী হতেন। তবে সীলমোহর সূত্রে এ কথা স্বীকার্য যে এই সম্প্রদায় ও তার দলপতিরা অবশ্যই কুলিন এবং অতীতে রোসাং অঞ্চলে তাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। তাদের কথিত চম্পক নগর রাজ্য হদিসহীন, যেটি রূপকথার পর্যায় থেকে মুক্ত নয়।

জুলকদর খানের জমি বন্দোবস্তি দান ও জুমকর সংগ্রাহক নিযুক্তি সূত্রে শের মস্ত খান ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা মোগল প্রজা। সম্মান সূচক রাজা ও রায় উপাধি দান তখনকার রেওয়াজ হলেও, এরূপ কোন সনদ থাকা অজ্ঞাত। তাদের রাজা উপাধির পক্ষে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলোঃ 'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা দেশের কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত নন। মূলতঃ তারা সাধারণ জুমিয়া, কুকি ও অন্যান্য অধিবাসী কর্তৃক নিযুক্ত রাজা।' (সূত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ খ্রীঃ)।

এতদসত্ত্বেও বৃটিশ আমলেই কর্তৃপক্ষীয়ভাবে চাকমা প্রধানদের রাজা সম্বোধন করা হতো, যা কি কেবল শ্রদ্ধা সূচকই ছিলো, না উপাধিমূলক? এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই। তবে চট্টগ্রামের প্রথম বৃটিশ প্রশাসক মিঃ হেরি ভেরেলষ্ট ফরমান সূত্রে স্বীকার করেছেনঃ ফেনী নদী, শঙ্খনদী, নিজামপুর সড়ক ও কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত কার্পাস মহাল যুক্ত চৌহদ্দির ভিতর রাজা শের মস্ত খাঁর জমিদারী অবস্থিত। (সূত্রঃ চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ স্মিত কর্তৃক, রাণী কালিন্দিকে লিখিত চিঠি, তাং ২রা জানুয়ারী ১৮৬৬ খ্রীঃ)।

এটাকে রাজ উপাধির পক্ষে কর্তৃপক্ষীয় স্বীকৃতি ভাবা যায়। এখানে এ কথাও পরিষ্কার যে, বৃটিশ আমল বা নিকট অতীতে এতদাঞ্চলে কোন স্বাধীন চাকমা রাজ্য বা

রাজত্ব ছিলো না, এবং কথিত্ রাজারা ছিলেন, কার্পাস মহাল, তথা জুম নোয়াবাদ ভুক্ত, জুম খাজনা সংগ্রাহক ও সরবরাহকারী জমিদার বিশেষ। যদিও আসলে কার্পাস মহাল ছিলো সরকারী খাস। সরকারকে খাজনা স্বরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা সরবরাহের অঙ্গীকারে বাৎসরিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা সরবরাহের অঙ্গীকারে, বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া হতো। এই বন্দোবস্তির নাম ছিলো জুম নোয়াবাদ। অঙ্গীকার খেলাফীর কারণে চাকমা প্রধানদের নামে প্রদত্ত ঐ ইজারা পরে বাতিল করে কয়েকজন হিন্দু বাঙ্গালীকে পর পর দেওয়া হয়েছে। ঐ ইজারাদারী জমিদারী নয়। কেবল পদুয়া অঞ্চলের বন্দোবস্তিভুক্ত ভূসম্পত্তিকে জমিদারী বলা যায়, যা আসলে ফেনী, শঙ্খ ও লুসাই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো না। নাম সূত্রে বুঝা যায়ঃ ঐ ভূসম্পত্তিটি কেবল রাজস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, যা পদুয়ারই সংযুক্ত পূর্বাঞ্চল। (সূত্রঃ রাজাজ ওফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস)

মুসলিম নাম খেতাব ও সীলমোহরে আল্লাহ্ রাব্বি বাণী, ঐ চাকমা প্রধানদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়াকেই সমর্থন করে। সাধারণ চাকমা প্রজাদের অনেকেও তখন এরূপ মুসলিম নাম ও খেতাবে পরিচিত ছিলেন। এটা কি তাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার নিদর্শন? বিষয়টি চিন্তনীয়।

সীলমোহর অনুযায়ী শের মস্ত খাঁর পরবর্তী চাকমা প্রধান হলেন জনৈকা সোনা বি, যার কার্যকাল ১৭৪০ সালে শুরু। তৎপরবর্তী চাকমা প্রধান বা সর্দার হলেন শের জব্বার খান, যার কার্যকাল ১৭৪৯ সালে আরম্ভ হয়েছে। এর সীলমোহরটি তিনটি ইসলামী নিদর্শন ধারণ করে, যথাঃ আরবী বর্ণ, আল্লাহ্ রাব্বি বাক্য এবং মুসলিম নাম ও খেতাব।

বলা হয়ে থাকে এই মুসলিম ও ইসলামী নিদর্শনগুলো, তখনকার মুসলিম প্রভাবজাত অনুকরণ, যা রোসাং রাজপরিবারেও ব্যবহৃত হয়েছে। শাহের অপভ্রংশ সাই শব্দটিও উপাধিরূপে ঐ রাজপরিবার আত্মস্থ করেন। কিন্তু চাকমা প্রধানদের বেলায় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলোঃ রোসাং রাজপরিবারের মত তারা নিজেদের বিকল্প নাম উপাধি পাশাপাশি ব্যবহার করেন নি। এই স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করেঃ চাকমা সর্দার পরিবার আদতেই মুসলিম ছিলেন। এই ইসলামী ধারা ঐতিহ্য, শের মস্ত খাঁর অষ্টম অধস্তন পুরুষ তব্বার খান পর্যন্ত অবিকৃত ছিলো। তৎপর নবম পুরুষ জব্বার খান ও তদীয় পুত্র দশম পুরুষ ধরম বখশ খানে এসে, ঐ ধর্মীয় বিশ্বাস বিকৃত রূপ ধারণ করে। তারা উভয়ে কালিভক্ত ছিলেন, যা তাদের সীলমোহরে বিধৃত আছে। মধ্যবর্তী সর্দাররা হলেনঃ নুরুল্লাহ খান ১৭৬৫ খ্রীঃ, ফতেহ খান ১৭৭১ খ্রীঃ, শের দৌলৎ খান, ১৭৭৩ খ্রীঃ ও জান বখশ খান ১৭৮৩ খ্রীঃ সাল। ধরম বখশ খাঁ- পত্নি বিধবা কালিন্দি রাণীও নিজে আমৃত্যু সর্দারী বিবি খেতাব ব্যবহার করেছেন। এবং ধরম বখশ খাঁর একমাত্র সন্তান মেনকাও পরিচিত ছিলেন চিকন বি নামে।

প্রথমে রাণী কালিন্দি স্বীয় স্বামী ও শ্বশুরের অনুকরণে এক সাথে মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের মিশ্র ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি খাঁটি বৌদ্ধানুরাগীতে পরিণত হোন। তার এই ত্রয়ী ধর্ম বিশ্বাসের নিদর্শন রূপে, উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে, নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ, একটি কালি মন্দির ও একটি বৌদ্ধ মন্দির অদ্যাবধি টিকে আছে। তৎপর চিকন বি পুত্র হরিশচন্দ্র, পরবর্তী সর্দার নির্ণিত হোন, যিনি স্বীয় পিতা গোপিনাথ দেওয়ান সূত্রে অমুসলিম নামের ধারক প্রথম রাজপুরুষ। ১৮৭২ সালে, লুসাই অভিযান কালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তার দ্বারা সহযোগিতা লাভ করেন, এবং তিনি সদারীর উত্তরাধিকারীও বটে। এহেতু কর্তৃপক্ষ তাকে পুরস্কার ও রায় উপাধি দানের দ্বারা সম্মানিত করেন। সে থেকে চাকমা সর্দারীর খেতাবে খান ও বিবির পরিবর্তে রায় উপাধির প্রবর্তন ঘটেছে। অথচ মাতৃ সূত্রে তো বটেই, দাদা থেকে উর্ধ্বতন তিন পুরুষ পর্যন্ত হরিশ চন্দ্র মুসলিম আভিজাত্যের ঐতিহ্য ধারক যথাঃ গোপিনাথ, পিতা মল্লাল খাঁ, পিতা চন্দর খাঁ, পিতা বুন্দার খাঁ। এই বুন্দার খাঁ হলেন বিখ্যাত চাকমা নায়ক রনুখাঁর সহোদর ভাই।

চাকমা অভিজাতদের খেতাবী ঐতিহ্য, স্থানীয় মুসলিম অভিজাতদের সমান্তরাল ও অভিন্ন হওয়ায় এই সম্ভাবনাই অধিক যে, তারা পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কিত ছিলেন। তাদের আবাসক্ষেত্র পদুয়া ও রাজানগর মুসলিম বাঙালী অধ্যুষিত ছিলো, এবং রাজানগর রাজবাড়ী অভ্যন্তরেই রাজপরিবারের মালিকানাধীন ভূমিতে মসজিদ ও কবরস্থান বিদ্যমান। সুতরাং তাদের একাংশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া অবধারিত সত্য। বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় ধারণা, এই সত্যটির প্রতি সমর্থন দান করে, যথা।

ক) 'চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভূত। তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপকভাবে আন্ত-বিবাহে আবদ্ধ।'

(সূত্র ঃ প্রাভীন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৪১০)

খ) 'চাকমারা আধা বাঙ্গালী। তাদের পোষাক পরিচ্ছদও তাই। আর ভাষাটিও একজাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধিসহ নামগুলো পর্যন্ত এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।'

(সূত্র ঃ চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ জীম বীম সেনের চিঠি নং ২২৭ এইচ, তাং ৫/৯/১৮৭৯ খ্রীঃ)

গ) 'সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকে মোগল ধর্ম গ্রহণ করে ও তাদের অনুগত হয় এবং খোদ চাকমা প্রধানরাও মুসলমানী নাম খেতাব ধারণ করে। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ও হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হোন। তবে শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে ও হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়।'

(সূত্রঃ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ খ্রীঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশ)

উপরোক্ত উদ্বৃতিগুলোঃ চাকমা মৌলিকতার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। এগুলো প্রমাণ করে চাকমা ও বাঙ্গালীরা পরস্পরের রক্তের অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলোঃ আজকাল সে

অতীত আত্মীয়তা বিস্মৃত। বিশেষতঃ চাকমা সমাজ চরমভাবে মুসলিম বিদ্বেষী। অথচ তাদের পন্ডিতরাই দাবী করেন চাকমা রাজা ধারা মিয়া বা ধরম্যা জনৈকা মোগল কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই দম্পতিরই সন্তান হলেন মোগল বা মোগল্যা। রাজা ভুবন মোহন রায়ের তালিকা অনুযায়ী তিনি হলেন ৩৩তম চাকমা রাজা। আজ সে রক্তের সম্পর্ক দূষিত হয় কেমন করে?

বলা হয়ে থাকেঃ অবাঙ্গালী পর্বতবাসীদের সাথে সম্পর্ক দূষিত হওয়ার কারণ বাঙ্গালীদের অত্যাচার ও শোষণ। উদাহরণ টানা হয়েছে যে, অভাবী পাহাড়ীদের বাঙ্গালী মহাজনেরা চড়া সুদে ঋণ দিতো, যা যথাসর্বস্ব দিয়েও শোধ করা যেতো না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, এটা একটি ফাঁকা অভিযোগ। মোগল আমলে তো বটেই, বৃটিশ আমলেও অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক হিন্দু মহাজনই এই সুদ ব্যবসায় জড়িত ছিলো। তাদের দমনের দায়িত্ব ছিলো সরকারের। মুরব্বী হেডম্যান ও চীফেরা তার প্রতিকার চাওয়ার অধিকারী ছিলেন। গুটিকয়েক হিন্দু মহাজন, পাহাড়ী সমাজপতি ও সরকারী প্রশাসনের মোকাবেলায় অতি তুচ্ছ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তাদের দ্বারা কেমন করে শোষণ ও নির্যাতন সম্ভব ছিলো? তদুপরি ওরা গোটা বাঙ্গালী সমাজের প্রতিনিধি ছিলো না। মুসলিম বাঙ্গালীরা তো ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাতেই চিরকল সুদের কারবার থেকে বিরত। সামাজিকভাবেও এ কাজটি তাদের কাছে ছিল হামেশা ঘৃণিত, ও সুদখোর সমাজচ্যুত হয়ে থাকে। হিন্দুদের মাঝেও অতি নগন্য সংখ্যক লোক এ পেশার সাথে জড়িত হোন। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগন্য। ১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে তারা ছিলো শতকরা আড়াই জন। আর ১৯৫১ সালে শতকরা ৮/৯ জন। তদুপরি স্থানীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানরা। তবুও যদি কতিপয় হিন্দু মহাজনের দ্বারা শোষণ অত্যাচার হয়ে থাকে, তাহলে ভাবতে হবে, প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃত্বের তাতে সায় ছিলো। সাধারণ বাঙ্গালীরা এর দায়ভার বহন করে না। বাঙ্গলীদের উপর শোষণ অত্যাচারের দোষ আরোপ করা নেহাতই ভুল। তদুপরি অতীতে উপজাতীয় মহাজনী শোষণ সত্য হলেও তাকে দোষারোপের পর্যায়ে আনা হয়নি।

এটা বিস্ময়কর যে, লোক বসবাসের যোগ্য, টিলাময় সমতল প্রাচীন আবাদী এলাকা হলেও, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার সীমানা ছেড়ে, পূর্বের পাহাড়ী পাদদেশ ধরে সীমান্তের দিকে ভিতরে চট্টগ্রামী বাঙালীদের কোন বসতি নেই। পাহাড়ীদের মাঝে কিছু তঞ্চঙ্গ্যা ও প্রধানতঃ কিছু মগ বা মারমা বসতি মাত্র অনেক দূরে দূরে বিদ্যমান। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে কিছু অস্থানীয় বাঙালীর বিস্তার ঘটেছে। চট্টগ্রামী বাঙালীদের নিজেদের সংলগ্ন অঞ্চলে বিস্তার না ঘটার কারণ সম্ভবতঃ এটাই ছিলো যে, তারা জুমজীবী পাহাড়ীদের না ক্ষেপাবার উদ্দেশ্যে, আপোষে পাহাড়ী জুম ক্ষেত্রগুলোকে, অনাবাদী রেখে দিতেন। অথবা পাহাড়বাসী অরাজক উপজাতিদের ভয়ে, সমতলে সংঘবদ্ধ

থাকাকেই নিরাপদ মনে করতেন। তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ এটাই ছিলো যে, তখনো সমতলে জমির প্রাপ্যতা ছিলো ব্যাপক, এবং সমাজবদ্ধতা ছিলো প্রয়োজনীয়। প্রশাসন ও সমাজপতিরা, পাহাড়ী ও বাঙালীদের মাঝে পারস্পরিক সংঘাত এড়াতে, উভয়ের জন্য পৃথকীকরণ নীতি হিসাবে, পাহাড়ে ও সমতলে বসবাসের সীমারেখা টেনে থাকতেও পারেন।

১৮৬০ সালের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো বৃহত্তর চট্টগ্রামেরই অংশ। তখনকার পাহাড়ী বাঙালীদের সবাই ছিলো চট্টগ্রামী পরিচিত। পাহাড়ে বসবাসের ব্যাপারে বাঙ্গালীদের উপর কোনরূপ পীড়ন ও বাধা নিষেধ না থাকলে, চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের দ্বারা পার্বত্য অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যাওয়াই সম্ভব ছিলো। ঔপনিবেশিক বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামীদের নিজেদের আপন জন্মভূমিরই এই পূর্বাংশে প্রবেশ ও বসবাস থেকে বঞ্চিত করে জারি করেন প্রশাসনিক আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর ৫২ ধারা এবং পাশাপাশি আরাকানী, লুসাই, বর্মী ও ত্রিপুরাদের জন্য অভিবাসন ও অনুপ্রবেশের ঢালাও সুযোগ করে দেওয়া হয়। পরিণামে এতদাঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় উপজাতি অধ্যুষিত একটি পকেট, যেখানে বাঙালীরা হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু। অবাঙালী সংখ্যা প্রাধান্যের উৎসাহে বাংলাদেশ আমলে রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা প্রসূত, উপজাতীয় অশান্তির সূত্রপাত হয়। এই উৎপাত উচ্চাশা একদিন বিচ্ছিন্নতার দিকে মোড় নিবে, এই ভয়ে, উপজাতীয়দের স্থানীয়ভাবে সংখ্যালঘুকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই সূত্র ধরে বাঙালী পুনর্বাসনের শুরু। বৃটিশ আমলের বাঙালী রোখার শেষ পরিণাম এটি। নতুবা আদি চট্টগ্রামী বাঙালীদের দ্বারাই পর্বতাঞ্চল হতো ঘন অধ্যুষিত। বাঙালী ও পাহাড়ীদের পর আপন হওয়ার বা বঞ্চিত আর অগ্রাধিকার লাভের পরিবেশ সৃষ্টি হতো না। এখনো চট্টগ্রামীরা পার্বত্যাঞ্চলে পাহাড়ীদের মত অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী। নিজভূমে তারা পরবাসী। এ কারণেই পাহাড়ী বাঙালী আর স্থানীয় অস্থানীয় বিরোধ। এতদাঞ্চল আদি চট্টগ্রাম ভূমি। তাই চট্টগ্রামীরা এখানকার আদিবাসী গণ্য হওয়ার যোগ্য। এ পথেই স্থায়ী শান্তি আসা সম্ভব। তখন প্রয়োজন হবে না অস্থানীয় পুনর্বাসনের। দুই আদি প্রতিবেশীদের এই সমঝোতার নীতি গ্রহণ, শান্তি স্থাপনকে নিশ্চিত করতে পারে। তখন বিচ্ছিন্নতার দোষারোপ থেকেও পাহাড়ীরা বাঁচবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনো ঘন বসতিপূর্ণ হয়নি। এখনো এতদাঞ্চল সর্বাধিক সম্পদশালী এলাকা। এখানে আরো কয়েকগুণ বেশি লোকজনের স্বচ্ছন্দ সংস্থান সম্ভব। পাশাপাশি ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আরাকান আরো অধিক ঘন লোক অধ্যুষিত। বহিরাগমন ছাড়াও স্বাভাবিক জন্ম বৃদ্ধির দ্বারা পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে। আগন্তুক শিশুদের যেমন ঠাঁই পাওয়ার অধিকার আছে, তেমনি ভূমিহীন ও বাস্তুহারাদের ও স্বদেশে কি বিদেশে আশ্রয় পেতে হবে। ভূমি ও খাদ্য সংকটের ভয়ে সে মানবিক চাহিদা থেকে পিছপা হলে হবে না। উৎপাদন সম্পদ সৃষ্টি ও মেধা ব্যবহারের মাধ্যমেই, অভাব পূরণ সম্ভব। অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণ সমাধান নয়।

পূর্বের ঐ পাহাড় শ্রেণী ক্রমান্বয়ে কাছে থেকে দূরে উঁচু ও দুর্লঙ্ঘ্য। উত্তরের দিকেও তাই। উত্তর ও পূর্বের ঐ দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ী দেওয়াল যেন বিদেশের আগ্রাসন থেকে রক্ষাকারী এক প্রাকৃতিক চৌকি। ত্রিপুরা, লুসাই ও আরাকানকে ঠেলে দূরে রাখছে ঐ পাহাড় শ্রেণী। নদী, উপনদী, ছড়া খাল ও পাহাড়ের ঢাল, সবই চট্টগ্রামের দিকে প্রবাহিত। তাই প্রাকৃতিকভাবেই চট্টগ্রাম হলো এতদাঞ্চলের জীবনমুখী সম্মুখভূমি। পশ্চাদভূমি ঐ আরাকান, মিজোরাম ও ত্রিপুরা এর স্বাভাবিক যোগাযোগ ক্ষেত্র নয়। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যকে চট্টগ্রাম ও বাঙালীদের সাথে জড়িত করে রেখেছে। তাই জটিলতার সমাধান এই স্বাভাবিক পথ ধরেই খুঁজে নিতে হবে।

বাঙালীরা উপজাতি বৈরী নয়। বাংলাদেশও তাদের পক্ষে বৈরী-রাষ্ট্র নয়। বাঙালী সদিচ্ছার বহির্প্রকাশ সর্বত্র বিদ্যমান। পদুয়া ভেদী প্রাচীন কাঁচা সড়কটির নাম এখনো স্থানীয় বাঙালীরা রাণী কালিন্দির নামে ধরে রেখেছে। এখনো শুক বিলাস রাজারহাট ও রাজভিলার নাম বহাল আছে। উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজারহাট রাজানগর ও রাণীরহাটের নাম পরিবর্তনে কোন বাঙালী এগিয়ে আসেননি। এখনো স্থানীয় বুড়ো বুড়িরা, চাকমা রাজাদের নামে ভক্তি গদগদ হোন। বলেন, আমাদের রাজা। স্থানীয় বাঙালী বৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা, আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে ঐ রাজা রাণীদের স্মৃতি চিহ্নসমূহ দেখিয়েছেন। ঐ রাজাদের স্থাপিত মন্দির, মসজিদ, কবরস্থান, দীঘি ও ফুল বাগিচার কথা বলে বলে তারা গর্ব অনুভব করেন। এটা অতীত সম্প্রীতি ও একাত্মতার রেশ।

চাকমা ভাষা, ঐতিহ্য, নাম ও খেতাব হলো, বাঙালী মসুলিম সমাজ ও চাকমা সমাজের সম্প্রীতি ও নৈকট্যের জলন্ত উদাহরণ। উভয়ের সামাজিক পরিভাষা প্রায় অভিন্ন, যথা : খোদা, দোজখ, সালাম, হুগুম, (হুকুম), কালাম, ইবিলিস (ইবলিস), হুজুর, বিবি, আদম, হেমান (হায়ওয়ান) ইদৎ, (ইয়াদ) মর্দ, দিল, আকল, তাকৎ ইত্যাদি। পাহাড়ী, বাঙালী, অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণমূলক আইনগুলো ক্রমেই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় একতায় বিভাজন সৃষ্টি করছে। উপজাতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ আইনী মর্যাদা, রাজনৈতিকভাবে এতদাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারকে ক্রমেই শক্ত ভিত প্রদান করছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে একদিন এতদাঞ্চল বলতে পারবে কোন বিবেচনায়ই বাংলাদেশ উপজাতিদের জাতীয় রাষ্ট্র নয়। সে উপজাতিদের আশা-আকাঙ্খার বৈরী দখলদার রাষ্ট্র। এর অবসান কাম্য।

রাষ্ট্রের এক-দশমাংশ অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিস্তৃত। অথচ এর অবাঙালী জনসংখ্যা জাতীয় জনসংখ্যার আধা শতাংশ মাত্র। প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাবে এটি প্রায় অর্ধেক বাংলাদেশ। বনজ ও খনিজ সম্পদের আকর এতদাঞ্চলের পাহাড় ও বনাঞ্চল, চিরকাল যাবৎ জাতীয় সম্পত্তিরূপে বিবেচিত। সংরক্ষিত বন, অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন, খাস পাহাড়, হ্রদ ও শিল্পাঞ্চলগুলো জাতীয় সম্পত্তি। মোট ৫০৯৩ বর্গমাইল আয়তনের

ভিতর ৪৬৫২ বর্গমাইল জুড়ে এই জাতীয় সম্পত্তির বিস্তৃতি। অবশিষ্ট ৪৪০ বর্গমাইল মাত্র স্বীকৃত বসতি অঞ্চল। স্থানীয় শাসন এই বসতিভুক্ত ৭/৮ শতাংশ অঞ্চলের উপরই প্রযোজ্য হতে পারে। বাকি ৯০/৯২ শতাংশ অঞ্চল কেন্দ্রীয় এখতিয়ারাধীন এলাকা। তবে এই কেন্দ্রীয় এখতিয়ার স্থানীয় মৌজা ও সার্কেল প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারা বিভ্রান্তিতে পতিত। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বহির্ভুত সমুদয় জায়গা জমিতে এই মৌজা ও সার্কেল প্রশাসন বিস্তৃত, যা উপজাতীয় মৌজা প্রধান হেডম্যান ও সার্কেল প্রধান চীফদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর দ্বারা জাতীয় সম্পত্তির বৃহদাংশ উপজাতীয়দের দখলাধীন। এই দখলদারীত্বের বলেই তাদের দাবী হলো : গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই উপজাতীয় ভূমি। এর প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় তহসিলদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন উপযুক্ত বিবেচিত হলেও তা নির্বাহী পর্যায়ে কার্যকর করা হয়নি। ঐ ভুলের খেসারত হলো : উপজাতীয় ভূমি অধিকারের দাবী। এখনো ঐ ভুলের প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় তহসিলদারী প্রবর্তিত হলে হারানো ভূমি অধিকার রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারে ফিরে আসতে পারে। নতুন করে তহসিলকরণ ব্যবস্থা অবশ্যই উপজাতীয় ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। সুবিধাভোগী মহল এর শক্তিশালী বিরোধীতায় নামবে। এখনই তারা ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বনায়ন প্রতিরোধে সংগঠিত আন্দোলনে তৎপর। এতদসত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থ সর্বাগ্রগণ্য। তহসিলকরণ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম রাষ্ট্রীয়করণের পথ। তাতে বিক্ষোভ বিদ্রোহ, ভূমিগত শক্তি হারিয়ে তারা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে রাষ্ট্রশক্তি হবে প্রবল। ১৭৯১ খ্রীঃ সালেই পার্বত্য অঞ্চলসহ গোটা চট্টগ্রামে তহসিল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জুম বন্ধ বা জুম চাষাধীন পাহাড় ও বন থেকে তুলাকর তুলে দিয়ে, নগদ টাকা ১৭৭৫/০০ বার্ষিক হারে, রাজা জান বখশ খাঁকে জুম নোয়াবাদের ইজারা মঞ্জুর করা হয়। ঐ জুম নোয়াবাদ বন্দোবস্তির স্থলাভিষিক্ত হয় রেগুলেশন নং ১/১৯০০ অনুমোদিত মৌজা ও সার্কেল প্রশাসন। উপেক্ষিত হয় তহসিল ব্যবস্থা। যা বর্তমান ভূমি অধিকার বিভ্রান্তির সূত্র। এখন পুনরায় সে আদি ও আধুনিক তহসিল নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় ফিরৎ যাওয়াই সমাধান। ভূমি ও রাজস্বের বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ অনভিপ্রেত। দেশের কোথাও এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। সংগৃহীত করের বৃহদাংশ সংগ্রাহকদের প্রাপ্য হতেও পারে না। যেমন- জুম করের এ(৫,৬) হেডম্যান ও চীফদের প্রাপ্য। ভূমিকর সহ আরো কিছু করের উপর ও তাদের কম বেশ এ(১০,১০০) কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়। এ হলো মালিকানাহীন জমিদারী। সারা উপমহাদেশ ব্যাপ্ত ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য আর অসংখ্য জমিদারী আজ বিলুপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশ পার্বত্য অঞ্চলে মালিকানাহীন জমিদারী বহাল রেখেছে। তাতে না জমিদাররা সন্তুষ্ট, না দেশ উপকৃত।

১৭৮৭ খ্রীঃ সালে রাজা জান বখশ খান কর্তৃক বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ন ওয়ালিসের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সশস্ত্র বৃটিশ বিরোধিতার অবসান হয়। কিন্তু তাকে নিজ সদর দপ্তর পদুয়ার পরিবর্তে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে পুনর্বাসিত হতে বাধ্য করা হয়। কারণ তদীয় বিদ্রোহী সঙ্গী সাথী রনুখাঁ, মুন গাজি ও কুকি দলপতিদের

নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রম তখনো সক্রিয় ছিলো। বৃটিশদের লক্ষ্য ছিলো জান বখ্‌শ খাঁকে ঐ বিরোধীদের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। রাজকীয় মর্যাদা ও সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে, বৃটিশ আনুগত্য মেনে নেয়া ছাড়া জান বখ্‌শ খাঁর কোন উপায় ছিলো না। দশ বছরের অসম প্রতিরোধ যুদ্ধে তার এই প্রতীথি জন্মেছিলো যে, বৃটিশ শক্তি অপরাজেয়। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মানে নিজের ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধিকে স্থায়ী ও নিশ্চিত করা। আক্রমণ ও আত্মগোপনের গেরিলা যুদ্ধে বৃটিশদের ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য করা গেলেও তাদের অবরোধ পার্বত্য অঞ্চল ও তার জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করেছে। সমতলের সাথে কাজ কারবার ও যোগাযোগ ব্যাহত। প্রশাসনিক স্থবিরতা ও পলায়নপরতায় স্বাভাবিক জীবন পর্যুদস্ত। শান্তি ও স্থিতিশীলতার অভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত। বনজ পণ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত। এই বিদ্রোহ অব্যাহত রাখা আত্মহনন তুল্য। সুতরাং সহযোদ্ধাদের অমতেই তিনি আত্মসমর্পণ ও সদর দপ্তর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিত্যক্ত হয় রাজভিলা ও শুকবিলাস। গড়ে তুলেন নতুন সদর দপ্তর রাজানগর। শিলক নদীমুখের বিপরীতে কর্ণফুলীর অন্যতম উত্তরমুখী উপনদী ইছামতির ৪/৫ মাইল ভিতরের আধা পাহাড়ী এলাকারই নদীতীর সমতলের একটি বাঁকে, গড়ে তোলা হয় বাড়িঘর ও লোকবসতি। নাম দেয়া হয় রাজানগর। কাছে দূরে গড়ে ওঠে হাট বাজার। পরিচিতি হয় রাজার হাট ও রাণীর হাট নামে। তবে পদুয়ার মত এই এলাকাটিও বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে কচিত দু-এক ঘর চাকমা দৃষ্ট হয়। এটি কি অতীত প্রতিচ্ছবি, বলা মুশকিল। তবে স্থানীয় বাঙালীরা চাকমা রাজ বংশীয়দের ভক্তি শ্রদ্ধায় এখনো গদগদ। বলেন ওরা আমাদের রাজা। তাদের ঐ ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজা ভুবন মোহন রায় উচ্চ বিদ্যালয়, যা রাজানগর রাজবাড়িরই দীঘির পাড়ে ও রাজার হাটের উত্তর অংশে অবস্থিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ সালে রাঙ্গামাটির বালুখালীতে রাজ সদর দপ্তর স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছরকাল রাজানগর রাজবাড়ি ছিলো চাকমা আভিজাত্যের কেন্দ্রবিন্দু। সে পর্যন্ত চাকমা রাজপরিবার ছিলেন নাম খেতাব ও আচরণে মুসলিম মোগলাই ঐতিহ্যের অনুসারী।

জান বখশ খান স্বীয় সীলমোহরে নিজেকে মহারাজ উল্লেখ করেছেন এবং তাতে তার প্রতিষ্ঠাকাল ১১৪৫ খোদিত আছে, এটাই অকাট্য প্রমাণ যে, তারা পারিবারিকভাবে জমিদার মর্যাদার অদিকারী ছিলেন, স্বাধীন রাজা নন। মঘী হিসাবে তার প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৭৮৩ খ্রীঃ যখন তিনি পিতা শের দৌলৎ খার অবর্তমানে নিজেই বৃিটিশ বিরোধী প্রধান বিদ্রোহী নেতা। জান বখ্‌শ খাঁর উত্তরাধীকারী প্রধান ছেলে তব্বার খাঁর ক্ষমতার স্মারক কোন সীলমোহর নেই। তবে তাঁকে পরবর্তী রাজা জ্ঞান করা হয়। ডঃ ফ্রান্সিস বোকা নন হেমিলটন, স্বীয় পুস্তক ইন সাউথ ইস্ট বেঙ্গল এর বর্ণনা মতে তব্বার খান, তার ভ্রমণকাল ১৭৯৮ সালে ক্ষমতাসীন ছিলেন এবং তিনি রাজানগরে নয়, রাঙ্গামাটিতেই আস্তানা গেড়েছিলেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সরকারী বিবরণ সূত্রে

অবগত হওয়া যায়, তিনিও বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধ ভেঙ্গে গেলেও অন্যান্য নেতাদের মত তিনিও পাহাড়াভ্যন্তরে নিরাপদ স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়ে, রাঙ্গামাটির হাজারী বাঁক এলাকার পাহাড়ে, আস্তানা গেড়েছিলেন। সীলমোহর সূত্রে পরবর্তী রাজা হলেন জব্বার খান, যার প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৮০১ সাল। তিনি হলেন ধর্মীয় বিভ্রান্তির হোতা। তার সীলমোহরে অংকিত আছে ঃ শ্রী শ্রী জয় কালি জয় নারায়ণ তারা জব্বার খান ১১৬৩। 'অক্ষর আরবী, ভাষা বাংলা, কালি নারায়ণ তারা দেবতার প্রতি ভক্তি ও মঘীসন সূত্রে বলা যায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের প্রতি একাত্মতার দীর্ঘ অনুসৃত পারিবারিক ঐতিহ্য ভেঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় বিভ্রান্তির সূচনাকারী ব্যক্তি। তদীয় পুত্র ধরম বখ্‌শ খাঁ ও তাই। মুসলিম নাম খেতাব, আরবী ভাষা ও বর্ণ এবং ইসলামী বাক্য আল্লাহু রাব্বির মাধ্যমে ১৭৩৭ সাল থেকে এই পরিবারের ইসলাম ধর্মও মুসলিম সমাজের প্রতি একাত্মতা দীর্ঘ ৬৪ বছরের মাথায় পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই বিবর্তন ১৩৭ বছরে পৌছে, হরিশচন্দ্র রায়ে এসে পূর্ণতা লাভ করে। তৎপর কেবল মোগলাই পোশাকী ঐতিহ্যই বহাল আছে। এখন রাজারা অভিষেক ও পূন্যাহ অনুষ্ঠানে, যদি অনুষ্ঠিত হয় ঃ মাথায় মোগলাই কায়দায় পাগড়ি বাঁধেন, গায় চড়ান সোরোয়ানী আচকান, কোমরে বাঁধেন খাপ সজ্জিত তলোয়ার। আমির উমারা সদৃশ গণ্যমান্য আর প্রজাদের সমবেত দরবারে তিনি কুর্ণিশ নেন, গ্রহণ করেন নজর নিয়াজ ও উপঢৌকন। এই অবশিষ্ট মোগলাই ঐতিহ্য বাদে, চাকমা রাজারা বর্তমানে পরিপূর্ণ অমুসলিম। ধর্মত এবং নাম উপাধিতেও তারা এখন বৌদ্ধ। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসটিও রাণী কালিন্দির শেষ জীবনে এসে পরিত্যক্ত হয়েছে। শের মস্ত খাঁই এতদাঞ্চলের প্রথম চাকমা প্রধান হওয়ার সূত্রে ১৭৩৭ সালকে তাদের এতদাঞ্চলে আগমন ও বসবাসের সূচনাকাল ধরা হয়। তার পূর্বের দেশ ও তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসাবে আনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যদিও একটি ঐতিহ্য গড়া ও ভাঙা সময় সাপেক্ষ। এ থেকে বলা যায়, তাদের ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য অবশ্যই পূর্বকালীন। আরাকানেও তাদের পরিচিতি তাই ছিলো। শের জব্বার খাঁর সীলমোহর তাই বলে।

সীলমোহর হলো ক্ষমতার প্রতীক। তাতে ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার অপ্রয়োজনীয়। তবু শের জব্বার খাঁর দ্বারা সে ঘোষণা দান, প্রমাণ করে, তিনি ইসলামের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও বিশ্বাসকে ক্ষমতার সমান চর্চনীয় মনে করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারো কারো ক্ষীণ ধারণা হলো : চাকমারা অতীতে এতদাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। বৃটিশ ঔপনিবেসিক শক্তি তা দখল করার চেষ্টা করায় ১৭৭৬ সালে চাকমা রাজা শের দৌলৎ খাঁ তা প্রতিরোধে লিপ্ত হোন। ঐ প্রতিরোধ যুদ্ধকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চাকমা বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এখন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, কোন অতীত বিবরণে স্বাধীন চাকমা রাজ্যের এতদাঞ্চলের কোথাও প্রতিষ্ঠিত থাকা সমর্থিত হয় কিনা। অথবা ঐ প্রতিরোধ

যুদ্ধটি সাধারণ পূর্ব ভারতীয়দের মত দখলদার বৃটিশদের বিরুদ্ধে সার্বজনিন স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ বলেও প্রমাণিত হয় কিনা।

চাটগাঁর কানুনগো দপ্তরে রক্ষিত রেকর্ড পত্রের ভিত্তিতে অধ্যাপক এ এম সিরাজুদ্দিন স্বীয় গবেষণা পত্র রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ উল্লেখ করেছেন ঃ শের মস্ত খাঁ নামীয় জনৈক চাকমা সর্দার আরাকান ত্যাগ করে চাটগাঁর মোগল শাসক জুলকদর খানের আশ্রয় লাভ করেন। ১৭৩৭ সালে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার মাওদা অঞ্চলে তাকে কিছু পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তি ও পাহাড়ী জুমিদারদের নিকট থেকে জুমকর আদায়ের নিযুক্তি, প্রদান করা হয়। তিনি স্বীয় খামার আবাদের কাজে কিছু চাকমা চাষী নিযুক্ত করেন। এই হলো এতদাঞ্চলে চাকমা বসতি বিস্তারের সূচনা পর্ব।

ঐ রচনায় দ্বিতীয় আরেক পাহাড়ী সর্দার বংশের স্বল্পস্থায়ী ১৩ বৎসরের বসবাস ও প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে, যারা চন্দন খাঁ বা তৈন খাঁ বংশ নামে পরিচিত। ১৭১১ থেকে ১৭২৪ সাল হলো এ বংশের প্রতিপত্তি কাল। তাদের প্রভাবিত অঞ্চল হলো একটি ক্ষুদ্র সীমান্তবর্তী এলাকা। এই বংশের শেষ সর্দার জালাল খাঁ আরাকানী রাজ আনুগত্য ত্যাগ করে, মোগল পক্ষ অবলম্বন করেন এবং কর দিতে চুক্তিবদ্ধ হোন। অবশেষে তিনি ১৭২৪ সালে বিদ্রোহ করায় দোহাজারীর মোগল ফৌজদার কিষণ চাঁদ কর্তৃক আক্রান্ত ও সদলে বিতাড়িত হন। তার ১৩ বছর পর শের মস্ত খাঁনের আগমন ঘটে। চন্দন খানের তৈন খান উপাধির সূত্রে অনুমান করা যায়, তিনি সীমান্তবর্তী তৈনছড়ি অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। চাকমাদের দাবী হলো : ধাবানা নামীয় তাদের জনৈক রাজা ঐ তৈনছড়ি মুখে বাঁশ বেতের সিংহাসনে আরোহন করে, অন্য রাজপদ প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জয়ী হয়েছিলেন। এই দুই বংশ একই চাকমা সমাজভুক্ত কিনা তা নিশ্চিত নয়। তবে চাকমা লোককাহিনীতে চানান খাঁ নামধারী রাজ পুরুষ আছেন। এটা উচ্চাভিলাষী সংযোজন হতেও পারে। কারণ উৎখাতকৃত বিদ্রোহী বংশের অপর এক সর্দারকে মাত্র ১৩ বছরের ব্যবধানে জমি ও ক্ষমতার মাধ্যমে পুনর্বাসন দান সন্দেহজনক। একমাত্র রাজা ভুবন মোহন রায়ই স্বীয় পুস্তিকা চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে প্রথম এই সংযোজন সাধন করেছেন। অথচ তার উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ রাণী কালিন্দি স্বীয় মন্দির গাত্রের বাণীতে শের মস্ত খাঁর পূর্ববর্তী কোন রাজাকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি ও লোককাহিনীকারদের সবাই শের মস্ত খাঁকেই আদি রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাজা ভুবন মোহন রায় ও তার পরবর্তীদের প্রদত্ত দীর্ঘ রাজতালিকা ও তাদের গুণকীর্তন, নিরেট উচ্চাভিলাষী সংযোজন। তাদের এতদাঞ্চলে রাজ ক্ষমতার অধিকারী হওয়াটাও ভুয়া। এই রাজত্বের দাবীর পক্ষে মোগল ইতিহাস, রোসাং ইতিহাস ও ত্রিপুরা ইতিহাস নীরব। প্রমাণ সূত্র হিসাবে কোন মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ, ঘোষিত রাজধানী ও বহির দেশীয় যোগাযোগ পত্রের কোন হদিস নেই। বহুল কথিত কল্প নগর ও চম্পক নগরের অবস্থান বহির দেশের কোথায় তাও অজ্ঞাত। রাঙ্গামাটির প্রতিষ্ঠাকাল

বৃটিশ আমল, যেটির রাজধানী হওয়া উপহাস্য।

চাকমা লোকগীতিতে আছে ঃ

"ঘরত গেলে মগে পায়,

ঝারত গেলে বাঘে খায়,

মগে ন পেলে বাঘে পায়,
বাঘে ন পেলে মগে পায়।
এলে মৈসাং লালচ নেই,
ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই,
চল ভেই লোগ চল যেই,
চম্পক নগর ফিরি যেই!"

এটা হলো লোক স্বীকৃতির প্রমাণ যে, অতীতে চাকমারা মগ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ছিলেন ও তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বদেশভূমি চম্পক নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তখন তাদের সর্দার ছিলেন মৈসাং নামক জনৈক ব্যক্তি; যার দোদুল্যমানতায় তারা তার প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। সেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পথে ছিলো বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল, যেটি ছিলা তখন মগমুক্ত নিরাপদ ও জনবিরল। অধিকন্তু সুদূর অতীতে পরিত্যক্ত স্বদেশভূমি চম্পক নগরের হদিস ও অবস্থান সম্পর্কেও তাদের স্মৃতি ছিলো বিভ্রান্ত। তাদের আদি অভিযাত্রী রাজা, সুদূর অতীতে এমনি স্বদেশ চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তনের মাঝপথে এ কারণে যাত্রা বিরতি করেছিলেন যে, পিতার মৃত্যুতে ছোট ভাই উদয় গিরি সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন। বড় ভাই বিজয় গিরি সেখানে অবাঞ্ছিত। সুতরাং মৈসাংপক্ষীয়দেরও সেখানে অভ্যর্থিত হওয়া অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামেই তারা অবস্থান গ্রহণ করেন। এই বক্তব্যটি রাধামোহন ধনপতি পালার চাটি গাং ছড়া বা ছাড়া পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং চাকমাদের আদি স্বদেশভূমি বা রাজ্য কোন এক অজ্ঞাত চম্পক নগর যার অবস্থান বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত। স্মৃতির মনিকোঠায় ও বাংলাদেশভুক্ত কোন স্বাধীন রাজ্য থাকার কথা ধারণকৃত নেই। নতুবা বর্ণিত লোকগীতিতে তার বর্ণনা সংযোজিত হতো।

চাকমা কৌলিন্য ও আভিজাত্যের প্রথম বক্তা হলেন রাণী কালিন্দি ও দ্বিতীয় বক্তা রাজা ভুবন মোহন রায়। এই দুজনের অতীত স্মৃতি বক্তব্যই সর্বাধিক প্রামাণ্য। রাণী কালিন্দির মন্দির গাত্রের লেখা এবং রাজা ভুবন মোহন রায়ের পুস্তিকা চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসের বর্ণনার কোথাও এ দাবী নেই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও অতীতে কোন স্বাধীন চাকমা রাজ্য ছিলো। অধুনা অতি উৎসাহী কিছু পন্ডিতের অনুরূপ দাবী উত্থাপন সম্পূর্ণ আজগুবী। বিদ্রোহী রাজা শের দৌলৎ খাঁ ও জান বখশ খাঁ থেকেও অনুরূপ কোন ফরমান বা দাবী থাকা প্রমাণিত নয়। তাদের নিকট কালের বংশধর ও

উত্তরাধিকারীরাও এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য রেখে যান নি। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাপারটি বাস্তব হয়ে থাকলে, কোন না কোন উপায়ে তার কিছু বর্ণনা ক্ষুদ্রাকারে হলেও থাকা সম্ভব ছিলো। চট্টগ্রামী স্মৃতিকথা, বই পুস্তক, আর গল্প গুজবেও তার কিছু রেশ পাওয়া যেতো। কিন্তু বিষয়টি সর্বাংশে উহ্য। এটাই প্রমাণ যে, এতদাঞ্চলে প্রাচীন চাকমা রাজ্য থাকার হাল-আমলকার কিছু পন্ডিতের দাবী, তাদের স্বকপোল কল্পিত। উদ্দেশ্যঃ ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, উপজাতীয় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে মদদ দান। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপচেষ্টা।

রাজা নগরে কিছু অতীত স্মৃতিচিহ্ন আছে যা মূল্যবান প্রত্নসম্পদ। তবে অবহেলিত। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত ইছামতি নদীর একটি বাঁক মুষ্টিতে, রাজবাড়িটি অবস্থিত। এখানে রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের পিতৃপক্ষীয় একটি পরিবার মাত্র ঘর করে আছেন। বাড়ীর সামনে পূর্ব দিকে পর পর দুটি দীঘি এবং ভিতরে একটি মহলী পুকুর আছে। পূরা চত্বরের দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পড়ো দালান, যার দ্বিতল প্রায় ধ্বসে গেছে এবং নিম্নাংশটিও ধ্বংসোম্মুখ। কোন মেরামতের উদ্যোগ নেই। পরিত্যক্ত ছাড়াবাড়ি এটি। চুন-সুর্কি ও ইটের গাথুনীতে খিলান পদ্ধতির নির্মাণ কৌশলে এটি নির্মিত। ভিতর ও আশপাশ গাছপালা ও বনে ঢাকা। এটির বিশাল ও দ্বিতল অবয়ব ঘোষণা করেঃ এর মালিকেরা অবশ্যই সম্পদ সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। এবং তাদের কার্যকাল ছিলো প্রথম বৃটিশ আমল, যখন ইটের চুন-সুর্কির গাথুনীযুক্ত খিলান পদ্ধতির মোগলাই নির্মাণ কৌশল প্রচলিত ছিলো। দুই দীঘির মাঝখানে উত্তর দক্ষিণমুখী সড়ক পথের ধারে দক্ষিণ অংশে রাজারহাট আর উত্তর অংশে রাজা ভুবন মোহন রায় উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। পূর্বের দীঘির উত্তর পাড়ে একটি মাজার ও মসজিদ এবং পূর্ব পাড়ের উত্তরাংশে একটি কবরস্থান বিদ্যমান। স্থানীয় জনগণের কাছে এটি হলো রাজাদের মসজিদ, ও কবর স্থানটি তাদের পারিবারিক। এখানে কোন সদ্য কবর নেই। সংলগ্ন মুসলিম পাড়ার কেউ এটি ব্যবহার করেন না। মাজারটি কার, তার কোন সঠিক হদিস নেই।

উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে ঃ রাণী কালিন্দি শের মস্ত খাঁকে চাকমা রাজ পরিবারের এতদ্দেশীয় আদি রাজা বা প্রথম প্রধানের মর্যাদা দিয়েছেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করেছেন।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ঃ তার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ রাজা ভুবন মোহন রায়ের দীর্ঘ রাজতালিকা এবং পরবর্তীদের দ্বারা তাতে আরো সংযোগ সাধন, নেহাত উচ্চাভিলাষী বাড়াবাড়ি। দুনিয়ার কোথাও এমন অখন্ড ও সুদীর্ঘ রাজ বংশীয় তালিকা থাকা নজিরবিহীন। এটি যুক্তি ও বিশ্বাসের সীমা লংঘন করেছে। এই অবিশ্বাস্য বাড়াবাড়ি, গোটা চাকমা ইতিহাসকেই অনেকাংশে সন্দেহপূর্ণ করে তুলেছে। এ থেকেই যুক্তির ভিত্তিতে অনেক কথা কাহিনীর যাচাই বাছাই ও কাট ছাট করার আবশ্যক হয়। বলতে বাধ্য হতে হয় ঃ গোটা চাকমা ইতিহাস হলো সত্য মিথ্যা ও রূপকথার সংমিশ্রণ। রাণী কালিন্দির পরবর্তী লেখক ও কাহিনীকারদের দ্বারা তা রচিত ও সংযোজিত।

`শের মস্ত খাঁকে আদি চাকমা রাজা ধরে নিলেও তার রাজকীয় কোন স্মৃতি নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মাওদা এলাকায় তাকে প্রদত্ত বন্দোবস্তির ফরমান ও পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুমকর সংগ্রহের নিযুক্তি পত্র এবং তার রাজ মর্যাদার পক্ষে প্রদত্ত সনদের কোন হদিস নেই।

রাজ পরিবার সূত্রে ৮/৯টি প্রাচীন সীলমোহর প্রকাশিত হয়েছে, যার ধারকরা হলেন যথাক্রমে (১) সোনা বি (২) শের জব্বার খান (৩) নূরুল্লা খান (৪) ফতেহ খান (৫) শের দৌলৎ খান (৬) জান বখশ খান (৭) জব্বার খান ও (৮) ধরম বখশ খান। এই তালিকার প্রথম চারজন রাণী কালিন্দি ও রাজা ভুবন মোহন রায়ের বর্ণনায় নেই। এর অর্থ কি এটাই যে, এরা চাকমা রাজবংশভুক্ত নন- অন্য লোক? তা হলে এদের সীলমোহর চাকমা রাজ পরিবারের অধিকারের কি করে থাকে? নয়তো স্বীকৃতি থেকে বাদ পড়েনই বা কি করে?

শের জব্বার খানের সীলমোহরটি এ ব্যাপারে কিছু তথ্য প্রদান করে। তাতে আছে রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাবিব, শের জব্বার খান ১১১১। আরবী বর্ণে ও অংকে লিখিত এই বর্ণনা। তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় : তার কর্মক্ষেত্র ছিলো আরাকানভুক্ত রোসাং অঞ্চল এবং সে দেশীয় মঘী পঞ্জিকা অনুসারে সে সময়টির শুরু ১৭৪৯ খ্রীঃ সালে। সুতরাং এটাই সম্ভব যে উল্লেখিত প্রথম চারজন আরাকানের রোসাংভুক্ত মূল চাকমা জাতি গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সর্দার ছিলেন।

শের মস্ত খাঁন অখন্ড সর্দাররূপে আনুষ্ঠানিকভাবে বরিত ছিলেন না। তিনি বিচ্ছিন্ন বিরোধী এক ক্ষুদ্রাংশের নেতারূপে নিজ অনুসারীদেরসহ দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ কারণেই তার আনুষ্ঠানিক সর্দারীর সীলমোহর নেই।

এখন চাকমাদের বৃহদাংশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস এবং আরাকান, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় নগণ্য সংখ্যায় পরিণত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে তারা বৃটিশ আমলেই ব্যাপকহারে এতদ্দেশে আগমন ও অভিবাসন গ্রহণ করেছেন। সেই অভিবাসনের অবাধ সুযোগ দানের প্রমাণ হলো রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর ৫২ ধারা যথা :

চাকমা, মগ অথবা এমন কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য, যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড়, আরাকান পার্বত্য অঞ্চল অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী এমন লোক ব্যতীত অন্য কেউ, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে না, যদি না তার কাছে জেলা প্রশাসকের বিবেচনাধীন মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

আইনটির নাম হলো ঃ পর্বতাঞ্চলে অভিবাসন। এই আইনটির বলেই, চট্টগ্রামীসহ স্বদেশবাসী বাঙালীরা ছিলো নিষিদ্ধ জন।

গ) আলীকদম ও তৈনছড়ি

১) দুর্গম পাহাড়ের ভিতর বার্মা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় মাতামুহুরী নদী উপত্যকার প্রত্যন্ত গভীর অঞ্চল হলো আলীকদম। মুসলিম এতিহ্য সমৃদ্ধ এ নামটি এবং

এতদাঞ্চল নিয়ে রহস্যঘেরা কিছু কথা কাহিনী আমাকে বহুদিন যাবৎ বারবার তা পরিদর্শনে আকৃষ্ট করেছে। প্রথম ১৯৭৩ সনে জাতীয় সংসদের ৩০০ নং সীটে ভাসানী ন্যাপের কেন্ডিডেট হিসাবে একবার আমি এতদাঞ্চল সফর করেছিলাম। চিরিঙ্গায় বাস থেকে নেমে মাতামুহুরী চর, টেক কাটা পথ, আর নদী এপার-ওপার করে পায়ে হেঁটে সারাদিনে লামা পৌঁছেছিলাম। যাত্রার দ্বিতীয় উপায় ছিলো, লগীঠেলা, নৌকায় শুয়ে বসে সারাদিন পরে গভীর রাতে লামায় পৌঁছা। তৎপর একই পয়দল বা নৌকায় আরো গোটা একদিন শেষে গভীর রাতে বা পরের সকালে আলীকদমে পদার্পণ। এখন চিরিঙ্গা লামা আধ ঘন্টায় এবং আলীকদমে আরা আধঘন্টা সময়ে যন্ত্রচালিত মটর যানে কেবল পৌঁছাই যায় না, কাজ সেরে দিনে দিনে চাটগাঁয় ফিরে আসাও যায়। আশির দশকে নির্মিত উপজেলা সংযোগ সড়কের বদৌলতে এই যাতায়াত সুযোগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

২২ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে রাঙ্গামাটি থেকে আলীকদমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। লক্ষ্য ঃ প্রথমে কক্সবাজার পৌঁছা, সেখানে ঘনিষ্ঠজন জাফর হানাফী ও তাঁর পরিবারের সাথে রাত যাপন এবং পরের দিন তাকে সহ আলীকদম ঘুরে দেখা। কিন্তু বিধি বাম। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক হানাফী, একটি সরকারী প্রোগ্রামে ব্যস্ত। সুতরাং পরের সকালে একাই আমাকে আলীকদমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হলো। প্রথম কক্সবাজার থেকে কোচে চিরিঙ্গা বা চকোরিয়া, তৎপর চড়াই-উৎরাই করে পাহাড়ী পথে জীপ গাড়িতে, ৪০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়াভ্যন্তরে আলীকদম। এখন পথ ও পরিবেশের যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, আগে তা ছিলো না। আগে ছিলো পাহাড়গুলো ঘন বনে আচ্ছাদিত। পথ ছিলো বনঘেরা বা নদী ও ছড়া বাহী। তাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি দৃষ্টিগোচর কমই হতো। এখন অধিকাংশ পাহাড় বনহীন নেড়া। সড়কগুলো পাহাড়ের ঢাল ও চূড়াবাহী। তাই দৃশ্যাদি দৃশ্যমান ও উপভোগ্য।

আমাদের জীপটি ফাস্যাখালি থেকে আলীকদম সড়ক পথে অগ্রসরমান। প্রথমেই নতুন চারা লাগানো ফাস্যাখালি বন এলাকা। এটি ছোটখাটো টিলা ভূমি ও সামনের মেরাইন থং পাহাড়ের চট্টগ্রামমুখী পশ্চিম-উত্তর ঢাল। কয়েক মাইল পর খাড়া পাহাড় শুরু হলো। ঘন বিপজ্জনক বাঁক, আর পাশে গভীর খাদ। মাতামুহুরী উপত্যকায় নামতে সড়কটিকে এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় ডিঙ্গাতে হয়েছে। এই আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই সরুপথ প্রায় দশ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। পাহাড় শীর্ষের পশ্চিম ঢাল থেকে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর ও তার দীর্ঘ বিস্তৃত উপকূল ভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ষা শরতের মেঘ ও ধোয়াহীন সকাল সন্ধ্যায় দৃশ্যমান ঝলমলে সাগর, আর সমতল সবুজ বেলাভূমি, দেখতে অপরূপ মনে হয়।

ফিরতি পথে আমি এই দৃশ্যটি উপভোগ করেছি। মনে হয়েছে ঃ এখানেও পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব।

ভিতরমুখী ঢালের উৎরাই পথে দেখা দিলো পূর্ব উত্তরের অদূরবর্তী চিম্বুক পাহাড় শ্রেণী। মাতামুহুরীর উপত্যকা ভূমি ফল ফসলে আর জনবসতিতে ভরপুর। অধিকাংশ চাটগেঁয়ে লে ক। এলাকাটি উর্বর ও সমৃদ্ধ। মাতামুহুরী ও শঙ্খ নদীকে মাঝখানে রেখে, এই এলাকার বৃহৎ পাহাড়গুলো, অগ্নিকোণ্ মুখী লম্বমান। উত্তর আরাকান পর্যন্ত এগুলোর বিস্তৃতি। তবে এই অঞ্চলে ভূমি ঢাল পশ্চিমমুখী। তাই এই অঞ্চলের নদীগুলো আরাকান সীমান্তে উৎসারিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত আর পশ্চিমমুখী বাঁক নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদী উপত্যকাগুলো খুব প্রশস্ত নয়। তবে আধা পাহাড়ী অঞ্চল বেশ চওড়া। এ কারণেই উপত্যকা আর আধা পাহাড়ী এলাকার সর্বত্রই জনবসতি বিস্তৃত।

এই নদীপথ প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর আরাকানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। এটি প্রাচীন বসতি অঞ্চলও বটে। এখানকার বিলুপ্ত প্রায় অনেক ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে, এতদাঞ্চলে একটি প্রাচীন সভ্যতা বিদ্যমান ছিলো। লোককাহিনী সূত্রে জানা যায়, আলীকদমের তৈন খাল বা তৈন ছড়িতে প্রাচীন চাকমা আধিপত্য ছিলো। তৈনছড়ির পারে বাঁশ বেতের সিংহাসন পেতে, চাকমা রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান হয়েছিলো। সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন ধুর্য্যা, কূর্য্যা, পীড়া ভাঙ্গা ও ধাবানা এই চার প্রধান পুরুষ। নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে সবার আগে ধুর্য্যা, স্ত্রীর বুক কাপড়ে পাগড়ি বেঁধে, সিংহাসন দখল করেন। তাতে জনসাধারণ কুপিত হয়ে তাকে পদচ্যুত করে। তৎপর ধাবানা শক্তি বলে ঐ সিংহাসন দখল করে রাজা হোন। এই সিংহাসন দখল ও তৈনছড়ি চাকমা রাজ্য শাসন ঘটনা, কিংবদন্তি হলেও বাস্তবে মাতামুহুরীর উপত্যকা অঞ্চলে বিস্তৃত চাকমা বসতি থাকার কথা, চাকমা ঐতিহ্যমন্ডিত বিভিন্ন পাড়া পরিবেশের দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই নদীর নিম্নাঞ্চলেও শাখা নদী বাঁক খালির পারে পারে, চাকমার কূল, ফতে খাঁর কূল, চন্দন্যার হাট ইত্যাদি অতীত বাস্তবতারই স্মারক।

এতদাঞ্চলে কোন চাকমা রাজ্য থাকার কথা সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লেখিত হয়নি। তবে অধ্যাপক এ এম সিরাজুদ্দিন স্বীয় গবেষণা পত্র, রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ উল্লেখ করেছেন, ১৭১১ খ্রীঃ সালে জনৈক চন্দন খাঁ ওরফে তৈন খাঁ মাতামুহুরী সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র উপজাতীয় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আরাকানী রাজার অনুগত সামন্ত। তার চতুর্থ পুরুষ জালাল খাঁ, মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করেন ও খাজনা দানে সম্মত হোন। কিন্তু ১৭২৪ খ্রীঃ সালে তিনি বিদ্রোহ করেন। তাতে দোহাজারীতে নিযুক্ত মোগল, ফৌজদার কৃষণ চাঁদ, তাকে ও তার লোকজনকে আক্রমণ ও আরাকানে বিতাড়ন করেন। এদের কার্যকাল মাত্র ১৩ বছর ব্যাপ্ত। এবং এরা যে চাকমা ছিলেন, তারও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। নামের দ্বারা বুঝা যায়, তৈন খাঁন তৈন ছড়িরই বাসিন্দা হয়ে থাকবেন। চাকমা কিংবদন্তিতে চন্দন খাঁ নামীয় কেউ নেই। তবে চানান খাঁ নামীয় এক রাজপুত্র আছেন, যিনি রাজা সাথুয়া বা

কথিত পাগলা রাজার পুত্র। তিনি ও তার ভাই রতন খাঁ, পিতা সহ নিহত হোন।

২) তৈনছড়ি বা তৈনখাল পাড়াবাসী আমার তংচঙ্গ্যা নাতি ও স্থানীয় বুদ্ধিজীবী শ্রীমান উচ্চতমনি তঞ্চঙ্গ্যা পথ নির্দেশনায় আমি কথিত পাগলা বাজার ভিটা ও তার পাশের পুস্করিণীটি দেখলাম। কোন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হলো না। কথিত আছে, পাগলা রাজা সাথুয়া অনেক সময় ক্ষেপে গিয়ে লোক হত্যা করতেন। তাতে তাঁর প্রতি অনেকে বৈরী ছিলেন। একদিন শত্রুপক্ষ রটনা করে দেয়ঃ পাগলা হাতি এসেছে। ঐ হাতি দেখতে জানালা পথে মাথা বাড়াতেই পিছনে ওৎ পেতে থাকা লারমা গোজার জনৈক প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি, অস্ত্রের আঘাতে পাগলা রাজার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরে ঐ দাঙ্গায় তার দুই পুত্র চানান খাঁ ও রতন খাঁও নিহত হোন। রাণী কিছুদিন ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হোন। এই দুর্দিনে হত বিহ্বল রাজপরিবার অসহায়। রাজকন্যা অমঙ্গলীর সাথে মলিমা থংজা নামীয় এক ব্যক্তির বিবাহ হয়। এই পক্ষে জন্মগ্রহণ করেন ধাবানা। অমঙ্গলীর দ্বিতীয় বিবাহ হয় কর্তায়্যা নামীয় জনৈক ত্রিপুরার সাথে। এই পক্ষে জন্মগ্রহণ করেন পীড়া ভাঙ্গা। পরে ধাবানাই তৈনছড়ির রাজ সিংহাসন দখল করে রাজা হোন। ঐ রাজা হত্যার সূত্রেই লারমা গোত্রের একটি শাখা রাজা কাবা গোষ্ঠী বলে ধিকৃত।

পাগলা রাজা সম্বন্ধে প্রচলিত দ্বিতীয় কাহিনী হলো, তিনি ধর্মভীরু সাধক ছিলেন। বন্ধ ঘরে তিনি নিজ নাড়িভুড়ি বার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতেন। একদিন উৎসুক রাণী ছিদ্রপথে ঐ দৃশ্যটি দেখে নেন ও হৈ চৈ করে ওঠেন। ফলে তাড়াহুড়ার ভিতর বহিষ্কৃত নাড়িভুড়ি যথাস্থানে সংস্থাপনে ব্যর্থ হোন। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি পাগল হয়ে যান।

এই পাগলা রাজার মা হলেন রাজকন্যা রাজেম বি ও পিতা বুড়া বড় য়া। রাজেম বির পিতা রাজা জানু। তারই সেনাপতি রণ পাগলার সাথে এই তৈনছড়িতে অনেক বার মগদের যুদ্ধ হয়েছে। এবং তার আগের ঘটনা হলোঃ রাজা অরুণ যুগের রাজ্য ও রাজধানী ছিলো উত্তর আরাকানের মইসাগিরি নামক স্থানে। জায়গাটি চীন পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল ও সীমান্ত নদী কালাদেইনের উপত্যকায় অবস্থিত। চাকমা আধিপত্যে শংকিত হয়ে আরাকানের মগরাজা মেংদি ঐ অঞ্চল আক্রমণ ও দখল করেন। চাকমা রাজা তিন রাজপুত্র, তিন রাণী, দুই রাজকন্যা, দশ হাজার প্রজা বন্দী ও বহু ধনরত্ন মগ রাজার হস্তগত হয়। দুই রাজকন্যার একজন মগ রাজা ও অপরজন তার মন্ত্রী পুত্র কর্তৃক স্ত্রীরূপে গৃহীত হোন। রাজা ও রাজপুত্ররা গৃহবন্দী থাকেন। বন্দী প্রজাদের এংখ্যং অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়।

পুরাতন মানচিত্র সূত্রে জানা যায়, এংখ্যং মাতামুহুরী উপত্যকায়ই অবস্থিত একটি জায়গা।

এই নির্বাসন ও উচ্ছেদ সত্ত্বেও আরাকান চাকমামুক্ত হয়নি। দেখা যায় ঃ বন্দী রাজপুত্র ঘাওটিয়া পরে দলপতি হয়ে গেছেন। তারই ছেলে রাজা মৈসাং। এই মৈসাং এর নামে এখনো চাকমা লোকগীতি প্রচলিত আছে, যথা ঃ

"এলে মৈসাং লালচ নেই;

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই;

চল ভেই লোগ চল যেই,

চম্পক নগর ফিরি যেই।"

আরাকান ত্যাগের এই আহ্বানে বলা হচ্ছে ঃ

"ঘরত গেলে মগে পায়

ঝারত লেগে বাঘে খায়

বাঘে ন খেলে মগে পায়

মগে না পেলে বাঘে খায়।"

উভয় সংকটে পড়ে সাধারণ চাকমারা বলছে, চম্পক নগর প্রত্যাবর্তনে রাজা মৈসাং এর আসার প্রতি আমাদের কোন লালচ নেই। না আসলেও ক্লেশ নেই। ভাই লোক চলো, আমরা স্বদেশভূমি চম্পক নগর ফিরে যাই। নইলে এখানে উভয় সংকট। ঘরে থাকলে মগেরা কাটে মারে। বনে আত্মগোপনে গেলেও বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ খোয়াতে হয়। এই বিপদ আর কাম্য নয়।

আরাকান থেকে চাকমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই ধারা পথেই তারা প্রথমে এংখ্যং ও আলীকদমের তৈনছড়িতে জমায়েত হতে থাকে। লক্ষ্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হলেও সেই সুদূর অতীতের চম্পক নগরের সঠিক ঠিকানা তারা ভুলে গিয়েছে। কোথায় যাবে? এই বিভ্রান্তির ভিতর স্থানীয় মুসলিম সামন্তদের সহানুভূতি ও সহায়তায় তারা মাতামুহুরী উপত্যকাকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে বসবাস করতে থাকে। এটাই হয়ে যায় তাদের নতুন স্বরাজ্য। তাদের দলপতি রাজারাও আচার-ব্যবহার ও রক্ত সম্পর্কে স্থানীয় মুসলিম সামন্তদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। শুরু হয়ে যায় মিশ্র সামাজিকতা। এই মিশ্র সামাজিকতারই ফল হলো, অভিজাত চাকমাদের মুসলমানী নাম খেতাব ধারণ, মুসলিম গৃহকোণের ভাষা ও আচার-আচরণের অভ্যাস, ও খান্দানী আড়ম্বর প্রীতি। এতেই চাকমা মহিলারা হয়ে গেলেন বিবি। বি হলো তার অপভ্রংশ। এই মিশ্র সামাজিকতার বিরুদ্ধে ধর্ম প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতে পারেনি। বাঙালী মুসলমান আর চাকমাদের বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তানেরাই পরবর্তীতে মিশ্র ভাষা, নাম ও পদবির অধিকারী হোন। ফার্সি শব্দ খেশ এর বহুবচন খেশাঁ, তার অপভ্রংশ, চাকমা উচ্চারণজাত খিসা, মানে আত্মীয়। মগ বংশজাত মুসলিম সন্তানদের চট্টগ্রামীরা বলেন জেরবাদী। এমনি

চাকমাজাত মিশ্র সন্তানেরা খিসা। এছাড়া উক্ত শব্দটির চাকমা ভাষায় কোন অর্থ হয় না। এ না হলে মুসলিম গৃহকোণের ভাষা, আচার আচরণ, চাকমা সমাজে সংক্রমিত হতে পারে না। এই অর্থে চাকমা ও চট্টগ্রামী বাঙালী মুসলমানেরা পরস্পরের রক্তের শরীক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। চট্টগ্রামী মুসলমানদের বহুজনের রং ও গঠনে মঙ্গোলীয় প্রভাব থাকার এটাই প্রধান কারণ। চাকমা রাজা ধারা মিয়ার মোগল মহিলা বিবাহের কাহিনীটি এই অর্থে একেবারে ফেলনা নয়। চাকমা অভিজাত মহিলাদের পর্দা পালন ও কবর দান রীতিটিও মিশ্র বিবাহজাত প্রভাবের ফলরূপে ভাবা যায়।

৩) তৈনছড়িকে স্থানীয়ভাবে আজকাল তৈনখাল বলা হয়। কিছু তংচঙ্গ্যা শাখাভুক্ত চাকমা এখানে বাস করে। সংখ্যার হিসাবে প্রথম সম্প্রদায় হলো বাঙালী, তৎপর মুরুং ও অন্যান্যরা। আলীকদম থানার জনসংখ্যার হিসাবে পরে তা প্রদর্শিত হবে।

তৈনখাল বা তৈনছড়ি মোহনার পূর্ব পারে মাতামুহুরী নদীর কূল ঘেঁষে একটি রহস্যময় টিলা আছে, তার নাম আলীর পাহাড়। এর ভিতরকার হরিণ ঝিরি নামীয় খাদটিকে সামনে রেখে কয়েকটি সুড়ঙ্গ ও তার শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থানীয় লোকদের ধারণা এটি ছিলো প্রাচীন লোক বা কোন সামন্তের আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম গুহা। সুড়ঙ্গের কোন কোনটি এঁকে বেঁকে দূরে পাহাড়ের অপর প্রান্তে অন্য ঝিরি বা খাদে বেরিয়ে গেছে। কোন কোনটি মাটি পড়ে বন্ধ। স্থানীয় সাংবাদিক স্নেহাস্পদ কামরুজ্জামান, বুদ্ধিজীবী উচ্চত মনি চাকমা গয়রো, ঝুঁকি নিয়ে সুড়ঙ্গ অভিযান করে মাত্র একটি সুড়ঙ্গেরই অপর প্রান্তের ঝিরিতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অক্সিজেন, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও অনুসন্ধানী টর্চের অভাবে তাদের পক্ষে অভিযানটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। উপরের দিকে এরূপ আরো সুড়ঙ্গ আছে বলে তাদের জবানে শোনা গেলো। এ পর্যন্ত কোন ধ্বংসাবশেষ দ্রষ্টব্য হলো না। তবে জানা যায়, উজানের দিকে মাতামুহুরী উৎস অঞ্চলে পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও পাকা ঘাটবাধা একটি দীঘি আছে। এলাকাটি দুর্গম, আর আরাকানী বিদ্রোহী উপদ্রুত। যাতায়াত ও অনুসন্ধান, বিপজ্জনক এবং কষ্টসাধ্য। এ মুহূর্তে সে অভিযান থেকে বিরত থাকলাম।

আমার উৎসাহ হলো আলীর পাহাড় নিয়ে। এই প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে কি করে আলীর পাহাড় নামকরণ হলো? এ নামটি অবিকৃত থাকলোই বা কি করে? এর সাথে সঙ্গতিশীল আঞ্চলিক নাম হলো আলীকদম। যদিও মঘী উচ্চারণে এটি বিকৃত হয়ে আলেহক্যাডং হয়েছে। আরাকানী ভাষায় স্থানীয় অনেক পাহাড় ও জায়গার নামে ডং বা দং উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: কেওক্রাডং, মেরেইন ডং ইত্যাদি। সম্ভবত ডং মানে পাহাড়। তাই আলীর পাহাড়ই মঘী ভাষায় আলেহ ডং। তা থেকে আলেহ কেডং বা খেদং বিকৃতি। কারণ এই অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন মানচিত্র, যা পর্তুগীজ পণ্ডিত জোয়াও ডে বারোজ কর্তৃক ১৫৫০ খ্রীঃ সালে অঙ্কিত হয়েছে, তাতে এতদাঞ্চলকে লোভাস

দোকাম নামে অভিহিত করা হয়েছে। তা আলী কদমেরই পর্তুগীজ ভাষ্য; আলেহক্যাডং এর নয়। আলীকদম নামের মঘী উচ্চারণে আলেহক্যাডং হয়ে যাওয়াই সম্ভব। মঘী ভাষায় এর বিভিন্ন অর্থ করা কষ্ট কল্পনা মাত্র। আলীর পাহাড় আর আলীকদম উভয় নামই মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত।

বাস্তবেও এতদাঞ্চল প্রাচীন মুসলিম অধিকৃত এলাকা। বিস্মৃত হলেও এখানকার প্রাচীন মুসলিম আধিপত্য, অল্প বিস্তর ইতিহাসে বিধৃত আছে। দেখা যায়, আরাকানের রাজা ইঙ্গ চন্দ্র ৯৫৩ সালে জনৈক সুলতানকে তাড়া করে চট্টগ্রামের দিকে অভিযান করেছেন এবং তাতে কুমিরার কাওনিয়া ছড়া পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চল তার দখলিভুত হয়েছে। সুরতান আরবী সুলতান শব্দেরই মঘী বিকৃতি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো রাজা। এটাই প্রমাণঃ বাংলায় মুসলিম সুলতানী আমল শুরু হওয়ার প্রায় তিন শত বছর আগে, দক্ষিণ চট্টগ্রামে মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে গিয়েছিলো। ১৩৩৯/৪০ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ প্রথম এই অঞ্চল বাংলা সুলতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৩০৬ খ্রীঃ সালে আরাকানের রাজা নরমিখলা, বর্মী রাজা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হোন। তিনি বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৪ বছর পর ১৪৩০ খ্রীঃ সালে সুলতান জালাল উদ্দিনের সহায়তায় তিনি স্বরাজ্য পুনর্দখল করেন। সেই অভিযানকালে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন বিজাতীয় শাসন থাকলে নির্বিবাদে তা ডিঙ্গিয়ে আরাকান দখল সম্ভব হতো না। রাজা নর মিখলার রাজ্য প্রতিরক্ষায় সুলতানী সৈন্যদের জন্য তথায় ঘাটি স্থাপিত হয়। রাজ্য পরিচালনায় তখন মুসলিম আমলাদেরও নিযুক্ত করা হয়। ওদের সঙ্গীসাথী হয়ে আরাকানে ভাগ্যান্বেষী সাধারণ বাঙালীরাও বিপুল সংখ্যায় যায়। এই প্রভাবে গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী শঙ্খ, মাতামুহুরী ও নাফ নদী উপত্যকা হয়ে পড়ে বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত। পরে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫১২ খ্রীঃ সালে গোটা চট্টগ্রাম নিজ দখলে আনেন। খোদা বখশ খান ছিলেন তার অধীন দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসক। এই প্রশাসনিক এলাকার সদর দপ্তর ছিলো আলীকদম। মিঃ বারোজের মানচিত্রে এই আলীকদম রাজ্য ও খোদা বখশ খানের শাসনের কথা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত আছে।

আমি উপজাতীয় বুড়াবুড়ি সূত্রে অবগত হই যে, আলীকদমে কিছু বিলীয়মান ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীন প্রশাসনিক সদর দপ্তর হওয়ার সূত্রে এখানে ইমারতাদি নির্মিত হওয়াও সম্ভব ছিলো। তাই প্রথম সুযোগেই কথিত চাকমা রাজার ভিটাটি পরীক্ষা করলাম। কিন্তু একটি পুষ্করিণী ছাড়া অন্য কোন ইমারতেরই চিহ্ন নেই। স্থানীয় উপজাতীয় লোকেরাও তার কোন হদিস দিতে পারলেন না।

স্নেহাস্পদ কামরুজ্জামানের মৌখিক জানলাম, নদীর বিপরীত তীরে নোয়াপাড়া এলাকায় প্রাচীনকালের ইট দৃষ্টিগোচর হয়। তারই সন্ধানে নদী পার হয়ে নোয়াপাড়া গেলাম।

নোয়াপাড়া হলো আলীর পাহাড়ের বিপরীতে নদী বাঁকের অপর পারের একটি বসতি। এখানে মগ ও বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস। অতীত স্মৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার লক্ষ্যে দেখা করলাম স্থানীয় অশীতিপর বৃদ্ধ মগ কারবারীর সাথে। তিনি বললেন ঃ ছোটবেলায় এ পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন। আগে তাদের বসতি ছিলো খানেক দূরের অন্য পাড়ায়। বাপ দাদার সূত্রে জানেন, এ পাড়ায়ই প্রাচীনকালে দুটি জমিদার বাড়ী ছিলো। তারা বাঙালী না পাহাড়ী ছিলেন, সে কথা তার মনে নেই। তবে তাদের বাড়ি ভিটার ইট খুলে তিনি নিজেও এই পাড়ামুখী রাস্তায় বিছিয়েছেন, যা এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৪) বৃদ্ধ মগ কারবারীর তথ্যানুযায়ী আমরা রাস্তা খুঁড়ে এক টুকরা প্রাচীন ইট পেলাম। তার গঠন প্রণালীতে মনে হলো এটি সুলতানী আমলের ইট। লম্বায় ইটখানা আস্ত বলে মনে হলো না। তবে পুরু দেড় ইঞ্চি মাত্র, আর পাশে সাড়ে চার ইঞ্চি। পাশের মাপ অনুযায়ী লম্বায় ইটটি তার দ্বিগুণ অর্থাৎ নয় ইঞ্চি হওয়ারই কথা। কারণ গাথুনীতে লম্বার আড়াআড়ি দুই ইটই খাটে। অথচ প্রাপ্ত ইটখানা লম্বায় মাত্র গড়ে সাত ইঞ্চি। ভাঙ্গার চিহ্ন পরিষ্কার না হলেও তার ব্যবহারিক পরিমাপ নয় ইঞ্চি লম্বা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, ইটটি লম্বায় আস্ত নয়।

আমাদের অনুসন্ধানের দ্বিতীয় স্থান হলো একটি পরিত্যক্ত স্তুপ। এটি একটি বাঙালী বাড়িতে অবস্থিত। বাড়ির মালিকেরা বললো, এখানে পুরাতন একটি ইটের ভাটা ছিলো। এখানে ভাঙা ইটের স্তুপ হাজামজা অবস্থায় থাকলেও গোটা কোন ইট বাহির করা সম্ভব হলো না। তবে টুকরা হলেও তা দুই ইঞ্চি পুরু বলেই মাপে পাওয়া গেলো। দৈর্ঘ্য প্রস্থ সন্দেহজনক থেকে গেলো। কামরুজ্জামান দু'খন্ড ইট একত্রে বসিয়ে একটি গোটা ইটের আনুমানিক নমুনা সাজালেন। কিন্তু আমার মনে হলো, এই নমুনার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সাড়ে আট ইঞ্চি ও সাড়ে এগারো ইঞ্চি হওয়াটা অস্বাভাবিক। প্রস্থের দ্বিগুণকে দৈর্ঘ্য ধরা হলে, এই মাপটিকে স্বাভাবিক জ্ঞান করা যায় না। তবে দুই ইঞ্চি পুরু হওয়াটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুই পুরুত্বের ইট প্রমাণ করে, দুই প্রাচীন সভ্যতা এখানে কার্যকরী ছিলো। ইউরোপিয়ানদের প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্মাণ স্মারক হলো ৩×৫×১০ ইঞ্চি পরিমাপের ইট। তার পূর্বেকার মুসলিম আমলের ইট ছিলো দেড় ইঞ্চি পুরু, যা বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনায় এখনো দৃশ্যমান। তবে দু'ইঞ্চি পুরু ইট, হিন্দু, বৌদ্ধ বা মগ আমলের হতে পারে। বর্ণিত বৃদ্ধ কারবারীর ভাষ্য অনুযায়ী এখানে একটি জাদি বা মঠ ছিলো। তারই ইট হয়তো এটি।

মোট কথা, বর্ণিত নির্মাণ সামগ্রীর অবস্থান গুণেই ভাবা যায় আলীকদম ছিলো একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ বসতি অঞ্চল। আলীকদম নাম মুসলিম আমলের। তবে আসল প্রাচীন নাম হয়তো অন্য কিছু। তৈনছড়ি নাম সূত্রে ভাবা যায়, এলাকাটি অবশ্যই বাংলা ভাষাভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিলো। তারা চাকমা অথবা বাঙালীও হতে পারে। হতে

পারে এতদোভয়ের দ্বারা গঠিত মিশ্র সমাজের লোক। মগও অন্যান্য পাহাড়ী লোকের অধিবাসও এখানে ছিলো। তাই আরাকানী পাহাড়ী ভাষায় স্থানীয় অনেক জায়গাও পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে। এই অঞ্চলে খোদা বখশ খান ও তার বংশধরেরা এবং তার পূর্বে আরো মুসলিম সামন্তেরা যেমন আধিপত্য চালিয়েছেন, তেমনি এখানে আধিপত্য করেছেন রোসাং রাজপুরুষ, আর চাকমা দলপতিরাও। সম্ভবতঃ এখানে মুসলিম সামন্তদের রোসাং রাজপুরুষ, আর চাকমা দলপতিরাও। সম্ভবতঃ এখানকার মুসলিম সামন্তেরা রোসাং রাজকীয় আধিপত্য মেনে নির্বিরোধ থাকতেন এবং চাকমা জনগোষ্ঠী ও দলপতিরা ছিলেন তাদের মিত্র ও স্বজন। মুসলিম নাম খেতাব ও ইসলামী পরিভাষা সমৃদ্ধ চাকমা ঐতিহ্যই প্রমাণ, এই দুই সমাজ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজনৈতিক লক্ষ্যে তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ ও মগদের বিরুদ্ধ পক্ষ। চাকমা রাজপুরুষ ও বাঙালী সর্দাররাই ছিলেন সে ঐক্যের সূত্র। খিসা জনগোষ্ঠী আসলে মুসলিম বাঙালী ছিলেন ও চাকমায় পরিণত হয়েছেন। না হলে খতনা করা ও দাড়ি রাখা মুসলিম চরিত্র আর সর্দার হলো মুসলিম ভাষাজাত পদবি। যা চাকমা গোত্রীয় নাম চেককাবা, দাজ্যা, সর্দায্যা ইত্যাদিতে সুপ্ত আছে।

আলীর পাহাড় নামটি বিস্ময়কর। সম্ভবতঃ আলী নামীয় কেউ এই পাহাড়টি আবাদ করেছিলেন, যার এই গোটা অঞ্চলের উপর সামন্ত আধিপত্য ছিলো।

ইটখোলা বা ইটভাটা রূপে প্রদর্শিত স্তুপটির দক্ষিণ পশ্চিমে পুষ্করিণীর মত একটি ডোবা আছে। তার কোন পার নেই। তার দ্বারা বুঝা যায়, এটি হয়তো ইটের মাটির গর্ত। নয়তো পার বাধা থাকতো। এই অঞ্চলে সাতটি পুষ্করিণী আছে। অন্যান্য যেগুলো দেখেছি সেগুলোতে পারের চিহ্ন আছে।

তৈন বা তিন সুরেশ্বরী নামীয় চাকমা রাজার ছেলেমেয়েদের নাম হলো : (১) জানু (২) রাজেম বি ও (৩) সাজেম বি। বি হলো বিবি শব্দের অপভ্রংশ, যা মুসলিম মহিলাদের ব্যবহার্য পদবি। সাজেম ও রাজেম শব্দ বি যোগে মুসলিম স্ত্রী বাচক নাম। এ হিসাবে জানু নামটিও পুরুষ বাচক মুসলিম জাহান বা জান এর বিকৃতি, বা ডাক নামই হবে। তাদের পিতার নামও এই মুসলিম ঐতিহ্যানুগ তৈন শের আলী হওয়া সম্ভব। ঐ তৈন শের আলীর নামে তৈন পারের পাহাড়টির নাম আলীর পাহাড় হওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন তৈন অঞ্চলের প্রধান এবং তার পুত্র পৌত্ররাও ছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে এই অঞ্চলের অধিবাসী চাকমাদের রাজা। উত্তর আরাকানের মইসাগিরি থেকে বিতাড়িত চাকমা ও তাদের কথিত রাজাদের এই অঞ্চলে পুনর্বাসন গ্রহণ সূত্রে তৈন সহ, মাতামুহরী ও বাঘখালি পারের ১২টি গ্রাম চাকমা অধ্যুষিত হয়। সম্ভবতঃ সে সময় ছিলো, স্থানীয় সামন্ত খোদা বখশ খানের বংশধরদের আমল।

আলীর পাহাড়ে খোদাইকৃত সুড়ঙ্গ থাকায়, ভাবা যায়, পাহাড়টিতে হয়তো বাড়িঘর ছিলো। এই বাড়ি ঘর নির্মাণে নদী পারের নোয়াপাড়া সমতলে ইট পোড়ান

সম্ভব। মনে হয় খোদা বখশ খান বা তার বংশধরেরাও প্রশাসনিক দপ্তর, আবাসিক গৃহ ও দুর্গাদি নির্মাণে ইট ব্যবহার করেছেন। তাদের আলী নামীয় কারো নামে পাহাড়টি পরিচিত হতেও পারে। উভয় সম্ভাবনা এখানে পাশাপাশি মান্য।

এর নদী-উপত্যকা-পথ, আরাকান ও বার্মার সাথে যোগাযোগে প্রাচীনকালে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, এখনো তেমনি ব্যবহারযোগ্য। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আর হাল আমলে সৈন্য চলাচল ও শরণার্থীর যাতায়াতেও এ পথটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৫) আলীকদম প্রেসক্লাবে বসে স্নেহাস্পদ উচ্চত মনি তঞ্চঙ্গ্যা ও কামরুজ্জামানের মুখে অত্যন্ত বিস্ময়কর দুটি কাহিনী শুনলাম, একটি শ্রুতি হলেও, অন্যটি বাস্তব।

শ্রুতিকথা হলোঃ মাতামুহুরী নদী তীরবর্তী বনে কর্মরত একদল কাঠুরে নদীর ঢালু পারে নির্মিত তাদের একচালা ঝুপড়িতে বিশ্রাম নেয়া কালে একজন জটাধারী উলঙ্গ লোক হঠাৎ এসে আবির্ভূত হয়। কাঠুরেরা ভয়ে আত্মরক্ষার্থে তার প্রতি তেড়ে আসে। তাতে লোকটি করুণভাবে হাত জোড় করে বলে ওহেঃ ভাইরা আমাকে মেরো না। আমি জিন-ভূত, পাগল বা দস্যু নই। আমি এক বিপন্ন লোক। আমাকে আশ্রয় দাও, এবং আমার ঘটনাটি শুনো।

লোকটির এই করুণ আহ্বানে কাঠুরে লোকেরা সংযত হয়ে তাকে আশ্রয় দিলো। তৎপর সে বলতে শুরু করলো তার কাহিনী। উৎসুক কাঠুরেদের গোল বেষ্টনীতে নিশ্চিন্তে বসে সে আদ্যপ্রান্ত বলে চললো।

কয়েক বছর আগে আমিও এক কাঠুরে দলের সদস্য হিসাবে এই এলাকায় বাঁশ কাঠতে এসেছিলাম। আমার নাম অমুক, আমার বাপের নাম অমুক। আমি অমুক পাড়া এলাকার বাসিন্দা। আমার সঙ্গী ও আত্মীয়- স্বজনেরা হয়তো এ বলে প্রবোধ পেয়েছে যে, আমাকে হিংস্র বাঘ বা ভল্লুক ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু না, আমি এক ডাইনীর কবলে পড়েছিলাম। পাহাড়ের ভিতর একা বাঁশ কাটছি। অমনি এক তাকড়া সুন্দরী মহিলা এসে আমার সামনে উপস্থিত। লতাপাতায় কোনমতে লজ্জাস্থান ঢাকা। বাকি সারা শরীর উদোম। পরিপূর্ণ যৌবনা, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল রং মহিলাটি নিঃশব্দে হাসিমুখে এক গোছা বন্য ফুল এগিয়ে দিয়ে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। আমি ভয় ভীতিহীন বিহ্বল। ভাবছি একি পরী, দেবতা, না বন মানুষ? আমার দেখা-জানা স্থানীয় পাহাড়ী মেয়েরা তো রং গঠন ও বেশ ভূষায় এরূপ নয়। সে নীরবে আমার হাত ধরে ইশারা করলো এগুবার। আমিও ভাবলাম, দেখি না রহস্যটা কী? এগুতে এগুতে সে আমাকে নিয়ে গেলো এক সংকীর্ণ পাহাড়ী গুহায়। ঢুকতে আমার ভয় হওয়ায়, সে আমাকে আগে আগে পথ দেখিয়ে টেনে টেনে এগুলো। গুহাটির মুখ সংকীর্ণ হলেও, ভিতর বাসোপযোগী চওড়া। সে থেকে শুরু হলো মেয়েটির সাথে আমার একত্রে বসবাস ও বন্দী জীবন। সে আমাকে গুহা থেকে বেরোতে দেয়না, এবং খাদ্য সংগ্রহে যাবার সময় গুহামুখে এক বিরাট পাথর

চাপা দিয়ে রেখে যায়, যেটি ঠেলে সরানো আমার শক্তিতে কুলায় না। সে আমাকে পাহাড় থেকে বন্য খাদ্যবস্তু এনে খেতে দেয়। অনভ্যস্ত হলেও, ক্ষুধার জ্বালায় সে সব খেতে আমি বাধ্য হই। একত্রে বসবাসের কারণে তার সাথে আমার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে সে গর্ভবতী হয় ও একটি সন্তান লাভ করে।

ইতিমধ্যে আমি মুক্তির আশা ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। সারাদিন ছেলেকে নিয়ে কাটাই আর সে পাহাড় বনে খাদ্যের সন্ধানে চলে যায়। অনেক সময় ফলমূল পাওয়া যায় না। তখন সে মৃত পশুপাখী ও তাদের পরিত্যক্ত নাড়ি-ভূড়ি নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে আমি সে সব খেতেও অভ্যস্ত হয়ে যাই।

একদিন লক্ষ্য করলামঃ গুহার ভিতর পর্যাপ্ত আলো। কারণ খুঁজতে বেরিয়ে দেখি, গুহার মুখে পাথর চাপা নেই। ভাবলাম মেয়েটি হয়তো বেখেয়ালে বা ভুলবশতঃ পাথর চাপা দেয়নি, অথবা আমার পালানোর নিশ্চেষ্টতা এবং সন্তানের পিতৃত্বে আমার প্রতি তার আস্থা বেড়ে গেছে। আমি মুহূর্ত দেরী না করে এই সুযোগটিকে কাজে লাগালাম। হামাগুড়ি দিয়ে গুহা মুখ উত্তীর্ণ হয়েই দিলাম প্রাণপণ ছুট। ভাবলামঃ ডাইনীটি দুপুরে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে ফিরবার আগে আমাকে নিরাপদ দূরে পালিয়ে যেতে হবে। দৌড়াতে দৌড়াতে এই তোমাদের দেখা। এখন আমার আশ্রয় ও বিশ্রামের দরকার। ডাইনীটি এসে খুঁজে পেলেও, এতজন মানুষের মাঝে আক্রমণ করার সাহস পাবে না।

আমি মহিলাটির পরিচয় জানতে পারিনি। আমরা কেউ পরস্পরের ভাষা বুঝতাম না। ইশারা, ইঙ্গিত, হ্যাঁ, হু ইত্যাদিতে তার আমার ভাব আদান-প্রদান হতো।

খাওয়া দাওয়া শেষে বিশ্রামের এক পর্যায়ে, এক পাহলোয়ান উলঙ্গ যুবতী মেয়ে, একটি বাচ্চা কোলে হঠাৎ ঝুপড়িটির সামনে এসে উপস্থিত। তার দৃষ্টি ও চেহারায় রাগ ও হিংস্রতার প্রকাশ। দুর্বোধ্য ভাষায় বাচ্চাটিকে দেখিয়ে চিৎকার দিয়ে কি যেন প্রতিবাদ ও ক্ষোভের কথা জানালো। মনে হলো লোকটাকে পারলে ধরে নেয়। ততক্ষণে কাঠুরেরা লাঠিসোটা ও দা-কুড়াল নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। মেয়েটি অনেকক্ষণ নিরুপায় আস্ফালন ও আহাজারি করলো। শেষে বুঝলো, লোকটাকে আর পাওয়ার আশা নেই। সেও তাকে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝালো, আর ফিরে যাবে না। নিরুপায় মেয়েটি কিছুক্ষণ বিলাপ করে গেলো। তৎপর হঠাৎ রাগে ও দুঃখে কোলের বাচ্চাটিকে এক টানে চিড়ে দ্বিখন্ডিত করে তার একটি খন্ড লোকটির দিকে ছুড়ে মেরে, অপর অংশকে বুকে জুড়িয়ে, হাউমাউ করে চিৎকার দিয়ে, পরিবেশকে ব্যথিত করে, বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলো। কাঠুরেরা এ দৃশ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভয়ার্ত। মেয়েটির প্রতিশোধ ও অজানা আপদের আশংকায় তারা তখনই আস্তানা গোটাতে লেগে গেলো। শুরু হলো তাদের বাড়িমুখী পশ্চাদপদ যাত্রা। সঙ্গে ঐ হতভাগ্য লোকটি।

দ্বিতীয় ঘটনাটিকে গল্প বলা যাবেনা। তার ভুক্তভোগী লোকটি এখনো জীবিত, আর এতদাঞ্চলে আছে। ঘটনাটি স্নেহভাজন উচ্চতমনি ও কামরুজ্জামানের দ্বারা পরীক্ষিতও বটে। এটি যুক্তির বিচারে অবিশ্বাস্য; তবে প্রত্যক্ষিত বাস্তব বলে উল্লেখযোগ্য। আমি ঘটনাটিকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এবং উপরোক্ত দুই স্নেহভাজনকেও উপক্ষো করি না। ঘটনাটির বিশ্বাস্যতা প্রমাণে আরো অনুসন্ধান দরকার।

৬) ঘটনাটি হলোঃ আলীকদমেরই একটি বাঙালী পাড়ায় বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছে লামা অঞ্চলের জনৈক মুসলমান যুবক। যাবার সময় বোন ও ভগ্নিপতির কাছে সে আব্দার জানালো, ভাগ্নিটিকে দাও, কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে বেড়িয়ে আসবে। মেয়েটির মা-বাবা ভাবলেন আপন মামা। আব্দার করছে। মেয়েটিও নানা বাড়ি যেতে আগ্রহী, আচ্ছা যাক। আপত্তির কি আছে। মামা-ভাগ্নিকে লামার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিলেন তারা। বললেনঃ কিছুদিন পর দিয়ে যেয়ো। আনতে যেতে পারবো না। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত আছি। মেয়েটির সম্পর্কের জন্য কিছু কিছু আলাপও আছে। দেরী করো না।

কিন্তু বেশ কিছু দিন হলো, মেয়েটির আসার কোন লক্ষণ নেই। ভাল-মন্দ খোঁজও নেই। চিন্তিত মা-বাপ।

এদিকে কাঠুরে আর রাখালেরা বলাবলি করছেঃ অমুক মেয়ের মত দেখতে অবিকল একটি যুবতী মেয়ে, অমুক গুহা মুখে বসে থাকতে প্রায়ই দেখা যায়। কাছে গেলে গুহার ভিতর আত্মগোপন করে। ঘটনাটি ভাবিয়ে তুলে ঐ মা-বাবাকে। তারা লামায় গিয়ে নানা বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখেন মেয়েটি সেখানে নেই। ঐ বাড়ির সবাই মেয়েটির বেড়াতে আসার কথা অস্বীকার করেন। কথিত মামাটি তো ভগ্নির বাড়ি বেড়ানো ও ভাগ্নিকে নিয়ে আসার কথায় বিস্মিত। মহা ফাপরে পড়েন সবাই। এ কেমন করে সম্ভব? জলজ্যান্ত মামার সাথে ভাগ্নিকে দেয়া হলো। অথচ ঐ মামাই বলছেঃ সে বোনের বাড়ি যায়নি, এবং ভাগ্নিকেও আনে নি। সে বাস্তবে মামা বাড়িতেও নেই, এবং লোকে বলে গুহামুখে দেখে। ব্যাপারটি কী? সারা অঞ্চল জুড়ে হুলস্থুল পড়ে যায়।

সিদ্ধান্ত হলো ঃ গুহামুখের ঐ মেয়েটিকে উদ্ধার করে দেখতে হবে, সে কে? জানতে হবে তার গুহাবাসের রহস্য। ঘনিষ্ট আত্মীয়রা সে উদ্ধার অভিযানে গেলেন। দেখা গেলোঃ সত্যই ঐ মেয়েটি গুহামুখে বসে আছে। দূর থেকে আত্মীয়দের ডাকাডাকিতে সে সাড়া দিলো না। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই সে আত্মগোপন করলো গুহার ভিতর। কিন্তু তাতে আত্মীয়রা দমিত হলেন না। সাহসের সাথে দু'একজন ভিতরে গেলেন, এবং মেয়েটাকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গুহায় তখন অপর কেউ ছিলো না। উদ্ধারের পর মেয়েটির স্বাভাবিক হতে অনেক দিন লেগেছে। তৎপর তার বিয়ে হয়েছে। ঘর সংসারও করছে। তবে ঘটনাটির ব্যাপারে সে হামেশাই চুপ। কোন জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় না, ও

কাউকে কিছু বলে না। উচ্চত মনি আর কামরুজ্জামানও মেয়েটির দেখা পেয়েছেন। তবে সাক্ষাৎ বর্ণনা দিতে তাকে কোন মতেই রাজি করান যায়নি। ঘটনাটি কেউ ভাবেন জিন ভূতের কান্ড, কেউ বলেন প্রেমঘটিত অত্যুক্তি, ও প্রতারণা। কিন্তু মা বাপের কাছে জলজ্যান্ত মামার অভিনয় করাটা তো প্রেমিকের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই ব্যাপারটি রহস্যাবৃত। একমাত্র ভুক্তভোগী মেয়েটাই এই রহস্যাদোঘাটনের সূত্র।

চাকমা লোকগাথা সূত্রে বর্ণিত হয়, মাতামুহুরী তীরের বারটি গ্রামেই তারা প্রথমে স্থানীয় মুসলিম অধিপতিদের আনুকূল্যে বসতি স্থাপন করেন। আরাকানের মইসাগিরিতে মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাকমা সমাজ ঐ অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হোন, এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নিকটবর্তী বাংলা অঞ্চলের মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য তাদেরকে এতদাঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করে। বলা হয়ে থাকেঃ তৈন সুরেশ্বরী, বা তৈন শের আলী ছিলেন এতদাঞ্চলীয় চাকমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রধান।

প্রয়াত যামিনী রঞ্জন চাকমাকৃত চাকমা দর্পণ পুস্তিকা সূত্রে জানা যায়, ঐ প্রধানের নাম তৈন সুরেশ্বরী। তবে প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায় স্বীয় পুস্তকঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে সে নামটি তিন সুরেশ্বরী বলেই উল্লেখ করেছেন। তবে আমার মনে হয়, এ নামটি তৈন শের আলী থেকে বিকৃত। কারণ সুরেশ্বরী নামটি স্ত্রীবাচক এবং তার সাথে তিন যোগ অর্থহীন। একজন গর্বিত দলপতির অর্থহীন স্ত্রীবাচক নাম কোনমতেই মানানসই, ও কাম্য নয়। যেহেতু তিনি ছিলেন তৈন খাল বা তৈনছড়িবাসী চাকমাদের প্রধান, এবং তার কথিত আবাস এলাকাটিও আলীর পাহাড় নামে খ্যাত, এবং এতদাঞ্চলেরই আরেক সামন্ত চন্দন খানের তৈন খান উপাধি ধারণের উদাহরণ বিদ্যমান, সেহেতু আভিজাত্যের সাথে মানানসই নাম তিন বা তৈন সুরেশ্বরী নয়,-প্রকৃতই তা তৈন শের আলী হওয়া সম্ভব।

তৈন খাল বা তৈনছড়ির আদি চাকমা বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে একটি চাকমা গোত্রের নাম হলো তৈন্যা গোজা। তাতে অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলো হলোঃ (১) কুজ্যা (২) উজ্যা (৩) কাম্যুয়া (৪) মুলিমা ও (৫) মেন্দর।

বিখ্যাত সাধক কবি শিবচরণ এই তৈনছড়িরই বাসিন্দা ছিলেন। প্রথমে তার বাসস্থান ছিলো রাজস্থলীর গারাওয়া নামক পাড়ায়। তবে সেখানে সংঘাত সংঘর্ষের কারণে তার পরিবার তৈনছড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে যান। তিনি ছিলেন অকৃতদ্বার। তার রচিত গীতিকাব্য: গজোনোর লামা হলো প্রাচীন চাকমা রচনার অন্যতম নিদর্শন। রচনাটি সমৃদ্ধ ভাষা ও উচ্চতর ভাবমন্ডিত। চাকমা সমাজে এটি ভক্তি সহকারে পঠিত ও গীত হয়। তার সময়কাল হলো ১০৮৪ বা ১১৮৪ মঘী সন, মোতাবেক ১৭২২ বা ১৮২২ খ্রীঃ। এই বিভ্রান্তির কারণ তার রচনার ৬ষ্ঠ লামায় ব্যক্ত এই পংক্তিটিঃ ১। 'এক হাজার চুরাশি সন/জন্মিল বুধবারে শিবচরণ। ২। এগার হাজার চুরাশি সন/জন্মিল বুধবারে শিবচরণ।

দ্বিতীয় বক্তব্যটি এগার হাজার হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এতো প্রাচীন কোন পঞ্জিকা নেই। এই শব্দদ্বয়ের দ্বিতীয়টি হাজার নয়, 'আর' হতে পারে। তবু দুই ভাষ্যে একশত বছরের ব্যবধান হয়। ইতিহাসের বিচারে ঐ সনটির ১৭২২ হওয়া সম্ভব নয়। রাজস্থলী ও তার আশপাশে শের মস্ত খানের মাধ্যমে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালের পরে চাকমা বসতি স্থাপিত হয়েছে। শিবচরণের জন্মস্থান হতে হলে, রাজস্থলীতে তার জন্মকাল ১৮২২ খ্রীঃই হবে, ১৭২২ খ্রীঃ নয়। শ্রদ্ধেয় যামিনী বাবুর এই ১৭২২ বক্তব্যটি ভুল।

৭) আমার অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো মুরুং নেতা বাবু মেনলের সাথে সাক্ষাৎ।

এই আলীকদম সদরেই তার বর্তমান বাসস্থান। তিনি বান্দরবন স্থানীয় সরকার পরিষদের ভূর্ত পূর্ব সদস্য ও বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধকারী মুরুং বাহিনীর সংগঠক ও কমান্ডার। শান্তিবাহিনীর গুলিতে এক পা হারিয়ে পঙ্গু। তবে নিঃসন্দেহে এক সাহসী পুরুষ।

শান্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ ও তার পা হারানোর কাহিনীটি দুঃসাহসী কান্ড। পড়ন্ত বিকেল বেলা, ফিরতি পথে বাসষ্ট্যান্ডে অবস্থিত তার বাসাতেই, আমাদের উভয়ের মাঝে স্নেহাস্পদ কামরুজ্জামানের মাধ্যমে অল্পক্ষণের আলাপ পরিচয়। তিনি বর্ণনা দিলেনঃ

শান্তিবাহিনীর জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে শঙ্খ উজানের থানচির বাসস্থান ছেড়ে ১৯৮৩ সালে মাতামুহুরী উজানের এই আলীকদম অঞ্চলে চলে এলাম। ধারণা ছিলোঃ এখানে শান্তি পাবো। স্বজাতীয় মুরুংদের প্রধান আবাসস্থল এই আলী কদম। এখানে আমাদের জনবল আছে। শান্তিবাহিনীর উৎপাত অসহ্য হলে, প্রতিরোধ করাও যাবে। কিন্তু আমার ধারণা মত এখানেও শান্তি ছিলো না। শান্তিবাহিনীর উৎপাতে মুরুংসহ সবাই অতিষ্ট ছিলো। স্বজন-পরিজন ও স্বজাতীয়দের সাথে মত বিনিময় শুরু করলাম। মুখ বুজে এভাবে কত সহ্য করা যায়? বুঝতে পারলাম প্রতিরোধের পক্ষে সাহসী ভূমিকা নিতে অনেকেই প্রস্তুত। কেবল সাংগঠনিক উদ্যোগ দরকার।

আমি লামায় স্বচক্ষে দেখেছিঃ পোপার তুকরং মুরুং কারবারীকে, শান্তিবাহিনীর ধার্যকৃত মালামাল পৌঁছে দিতে দেরী করায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। থানচিতে আমি দেখেছি ছমদ কাপিতাং নামীয় জনৈক বাঙ্গালী বেপারী কে দিয়ে কবর খুঁড়িয়ে, তাকে মেরে, ঐ কবরেই মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। তৎপর এই আলীকদমেরই মাতামুহুরী রিজার্ভের মেংরা কারবারী পাড়ার হতভাগিনী কম্পং মুরুংনী স্বামী লইয়া মুরুংকে গর্ভবতী অবস্থায় হত্যা করে। তার পেট কেটে জীবন্ত শিশুটিকেও টুকরা টুকরা করে কেটে উল্লাস করেছে শান্তিবাহিনীর নরাধমেরা। আর সহ্য হচ্ছিলো না। আমি প্রতিরোধে বিশ্বস্ত সঙ্গী সাথী যোগাড়ে সচেষ্ট হলাম। প্রাথমিকভাবে সহযোগী পেলাম ৭ জন। শান্তিবাহিনীর আরো ৪ জন সদস্য আমাদের সাথে সহযোগিতায় সম্মত হলেন। শুরু হলো আমাদের শান্তিবাহিনী দমনের নিরস্ত্র অভিযান। ভাবলাম অস্ত্র দরকার। তবে তা

শত্রুদের থেকেই কেড়ে নিতে হবে। অস্ত্র ছাড়া অস্ত্রধারীদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সে হলো ১৯৮৫ সাল।

কাচিপিয়ার লোংরা পাড়ার ঝিন ঝিরিতে শান্তিবাহিনীর একটি আস্তানা ছিলো। আমরা গোপনে অনুসন্ধান করে, পথঘাট ও আক্রমণের সুযোগ সুবিধা নির্ধারন করে ওৎ পেতে থাকলাম। আমাদের অস্ত্র হলো দা, কুড়াল, লাঠি-সোটা ও গাদা বন্দুক।

রাত শেষ প্রায়। অমনি ঝাপিয়ে পড়লাম শান্তিবাহিনীর ঐ আস্তানায়। গাদা বন্দুকের আওয়াজ হতেই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জেগে উঠে যে যেদিকে পারে দিলো ছুট। অল্পক্ষণে সবাই উধাও। আমাদের দখলে এসে গেলো আস্তানাটি। তাতে পাওয়া গেলো ১টি রাইফেল, ২টি এস এল আর, ১টি এল এম জি আর ৭৫০ টি গুলি। আমাদের প্রাথমিক অস্ত্র ভান্ডার গড়ে উঠলো। এই সাফল্যে উৎসাহিত হলেন অনেকে। তাতে আমাদের সদস্য সংখ্যাও বেড়ে গেলো।

অনুমান হলোঃ উক্ত অভিযানকে শান্তিবাহিনী সেনা আক্রমণ বলেই মনে করেছিলো। কিন্তু পরে তারা নিশ্চিত হয় যে, মুরুংরাই এর হোতা। ফলে মুরুংদের উপর তাদের উৎপীড়ন বেড়ে যায়। এবং আমরাও তা প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্প হই। আমাদের এই অভিযান ও সাফল্যের কথা পরে সেনাবাহিনীর গোচরীভূত হয়, এবং তারা আমাদের প্রতি সহযোগিতা দান শুরু করে। আমরা কাচিপিয়া অভিযানে অস্ত্র ছাড়াও শান্তিবাহিনীর গুদামজাত করা প্রায় ৫/৬ হাজার মন চাউল পেয়েছিলাম।

আমাদের দ্বিতীয় অভিযানক্ষেত্র হলো মধুতে অবস্থিত শান্তিবাহিনীর আস্তানা। আমরা খবর পাই যে, সেখানে এতদাঞ্চলীয় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা একটি মিটিং উপলক্ষে সমবেত হয়েছে। মুরুং বাহিনীর ৯৩ জন সদস্য নিয়ে আমি ঐ এলাকাটি ঘেরাও করে ফেলি। ফলে উভয় দলে সংঘর্ষ হয়। দুজন শান্তিবাহিনী সদস্য মারা যায়; ও বাকিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এবারও আমরা দুটি অস্ত্র হস্তগত করি।

এরপর মধুরেংক্রং পাড়ায় শান্তিবাহিনীর সাথে আমাদের তৃতীয় মোকাবেলা হয়। সেখানে আমি নিজে হাতে পায়ে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হই। আমার দলের অপর একজন যোদ্ধা নিহত হয়। তবে শত্রুপক্ষে দুজন নিহত আর আহতের সংখ্যা অনেক।

আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য আমাকে চকোরিয়ার মালুমঘাটে অবস্থিত ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যেখানে আমার একটি পা কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। এই কাটা পা-ই বিদ্রোহী ও অত্যাচারী শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে, এবং দেশ ও জাতির পক্ষে পরিচালিত আমার সশস্ত্র সংগ্রামের স্বাক্ষী। পঙ্গু হলেও এই কাটা পার জন্য আমি গর্বিত। তবে আমি অতৃপ্ত এ কারণে যে, শারীরিক অক্ষমতা আমাকে শান্তিবাহিনী দমনে অধিক এগুতে দেয়নি।

সরকার মুরুংদের অবমূল্যায়ন করছেন দেখে আমি দুঃখ পাই। চুক্তি অনুযায়ী সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে মুরুংদের নয়, তাদেরই ক্ষুদ্র শাখা সম্প্রদায় ম্রদের উপজাতি ঘোষণা করেছেন। অথচ তারা সংখ্যায় শতের কোটায় সীমাবদ্ধ, আর আমরা ২২ হাজারের অধিক। এটা কি জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধ প্রভাবের ফল?

আমরা দেশপ্রেমিক ও বাংলাদেশী জাতির স্বপক্ষ। শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বউদ্যোগে পরিচালিত সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ রেখেছি। যদি প্রকৃত চরিত্রের ভিত্তিতে উপজাতি নির্ধারণ করা হয়, তা হলে অন্য অনেকের চেয়ে বাস্তব উপজাতি আমরাই। আমাদের সরাসরি উপজাতি স্বীকৃতি না দিয়ে, ম্রদের দলে ব্রেকেটভুক্ত করা, সঠিক মূল্যায়ন নয়। সরকারের কাছে আমাদের আরো দাবী হলো, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেয়া হোক। আমরা এখনো আদিম অনুন্নত মানুষ। একমাত্র জুম চাষ পেশাই আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়, যা আজকাল জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ও বিভিন্ন পেশাগত যোগ্যতা অর্জিত হলে, আমাদের আদিম জীবন-যাপন পদ্ধতি, ও জীবিকা নির্বাহে পরিবর্তন আসবে। তাই এখন আমাদের দরকার শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ। ফল-মূল, গাছ, বাগান ও পশু পালনেও আমাদের সহায়তা করা হলে, জুম নির্ভরতা কমবে। জুমে এখন আর যথেষ্ট ফল ফসল পাওয়া যায় না। বন জঙ্গল গাছপালা আর পশু পাখীর পক্ষেও তা ক্ষতিকর। বন, পশু, পাখী আমাদের সম্পদ।

বাবু মেনলের সাথে আলাপে মনে হলোঃ অশিক্ষিত হলেও তিনি একজন চেতনা সম্পন্ন মানুষ। নেতৃত্বের গুণও তার মাঝে আছে। দেখলাম তাকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে আলাপ ও আড্ডারত একদল মুরুং নারী-পুরুষ। এদের সবাই নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শ নিতে এসেছে।

৮) কামরুজ্জামান ও উচ্চত মনি ছাড়াও অনেকের মুখে শুনলাম আলীকদম লেখা একটি পাথর খণ্ড এখানকার বন বিভাগীয় অফিস ঘাটে বহুদিন যাবৎ অবহেলা অবজ্ঞায় পড়ে ছিলো। শেষে কে বা কারা ঐ শিলা খণ্ডটিকে বাজার মসজিদের প্রাঙ্গনে নিয়ে রাখেন। পরে ঐ মসজিদটি পুনর্নির্মাণের সময় অসাবধানতাবশতঃ পাথরটি ভিটার ভিতর চাপা পড়ে যায় বলেই মনে হয়, অথবা কেউ তা সরিয়ে নিয়ে থাকবেন। এ কারণে বহুদিন যাবৎ পাথরটি গায়েব। কেউ তার সঠিক হদিস জানেন না।

আমার মনে হয় পাথরটি একটি মূল্যবান প্রত্ন নিদর্শন রূপে, কিছু স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্যের ধারক ছিলো। পুরাতন ইমারতাদির গায় ঐরূপ বিভিন্ন তথ্য লিখিত পাথর এখনো দৃষ্টিগোচর হয়। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় অবস্থিত শাহী জামে মসজিদের দেওয়ালে অনুরূপ তথ্য সম্বলিত পাথর স্থাপিত আছে। ওলি খাঁর মসজিদ ও নসরত খাঁর মসজিদও অনুরূপ পাথর ধারণ করে আছে। সিলেটের শাহ জালালের দরগায় বিভিন্ন

লেখা সম্বলিত বেশ কিছু পাথর স্থাপিত আছে। ওগুলোতে নির্মাণ ও বিজয় বিবরণ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান পুরুষদের বর্ণনা সন তারিখসহ খোদাইকৃত পাওয়া যায়। অতীত ইতিহাসের পক্ষে এগুলো হলো মূল্যবান ও প্রামাণ্য সূত্র। পাথর খোদাই বিবরণ, ইমারতাদির গায় স্থাপন হলো প্রাচীন ভারতীয় মুসলিম ঐতিহ্য।

আলীকদমে দর্শনযোগ্য কোন প্রাচীন ইমারত এখন আর অবশিষ্ট নেই। বর্ণিত পাথরটি অজ্ঞাতে অবহেলায় খোয়া যাওয়ার মত প্রাচীন স্থাপনাগুলো যে মানুষের দ্বারাই ধ্বংস হয়ে গেছে, তা একরকম নিশ্চিত। প্রাচীন ইট সুরকি আর ইট ভাটাই প্রমাণ এতদাঞ্চলে পাকা ইমারতাদি ছিলো। খোদাই ও অনুসন্ধানের দ্বারা তার হদিস পাওয়া যেতে পারে। আলীকদম বর্ণনা সম্বলিত পাথরটির ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতাদির কোনটির সাথে যুক্ত থাকা সম্ভব। এও সম্ভব যে, শুধু আলীকদম নয়, আরো কিছু বর্ণনা তাতে ছিলো। পাথরটি প্রাচীন সুলতানী আমলের আরবী অক্ষর সম্বলিত হলে সে বর্ণনাটির ভাষা আরবী হতে পারে। প্রাচীন সুলতান ওরফে সুরতানদের আমল হলো প্রথম সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দী। ওদের দক্ষিণ চট্টগ্রামে আধিপত্য থাকার কথা, আরাকানী রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্রের ৯৫৩ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের দিকে জনৈক সুলতানকে তাড়িয়ে যুদ্ধাভিযান করার মাধ্যমে জানা যায়।

যদি পাথরটি পরবর্তী বাংলার সুলতানী বা মোগল আমলের হয়ে থাকে, তা হলে তার ভাষা হবে সে আমলের সরকারী ফারসী। পাথরটি পাওয়া গেলে, সে মূল্যবান তথ্যটি অবগত হওয়া যেতো। দুর্ভাগ্য যে, পাথরটি অবজ্ঞা অবহেলার ফলে হারিয়ে গেছে। এটা এক অপূরণীয় ক্ষতি। পাথরটির বর্ণনার ভাষাই বলে দিতো এখানকার মুসলিম আধিপত্য কালটি প্রথম সহস্রাব্দের সময়কার ছিলো কিনা। যদি তাই হতো তা হলে সেটি হতো স্থানীয় মুসলিম ইতিহাসে এক মূল্যবান সংযোজন।

এখানে আরো প্রত্ন নিদর্শন ও পুরাবস্তু পাওয়া সম্ভব। তজ্জন্য দরকার গভীর অনুসন্ধান ও ধ্বংসস্তূপ খোদাই। আমার আক্ষেপ যে, আমি এ কাজটির পক্ষে যোগ্য ও সঙ্গতিশীল ব্যক্তি নই। এই সাথে ভেবে দেখা দরকার যে, চাকমা রাজ পুরষদের ব্যবহৃত সীলমোহরগুলো আরবী বর্ণ ও ভাষায় কী করে অলংকৃত হলো। এগুলোর দ্বিতীয় প্রাচীনতম সীলমোহরটি হলো জনৈক শের জব্বার খাঁর। তাতে আরবী বর্ণ ভাষা ছাড়াও ইসলামী বিশ্বাসের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। রাধা মোহন ধনপতির পালায় আস্ত একটি আরবী বাক্যই স্থান করে নিয়েছে। যথাঃ লবিয়ত সবিয়ত থুম। (আরবী < তাম)

এটা কি সে প্রাচীন আরবী সুলতানী প্রভাব, যা ভাষা ও ধর্ম বিশ্বাসে চাকমা সমাজে সংক্রমিত?

এখানে এই সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা দরকার যে, চাকমারা কি এতদাঞ্চলের কোথাও, কোনরূপ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? তা হলে কখন এবং কোথায় সে রাজ্যটির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব?

তখন বাংলায় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকাল। ১৪০৬ খ্রী: সালে আরাকানের রাজা নর মিখলা সিংহাসনচ্যুত হোন। তিনি পালিয়ে গিয়ে গৌড়ের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই নর মিখলা সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ সাহেব সহায়তায় ১৪৩২ খ্রী: সালে স্বরাজ্য পুনর্দখল করেন। তিনি পুনরায় সিংহাসনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচতে ও বর্মী আক্রমণের ভয়ে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক শক্তির বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈনিক ও আমলাদের স্বরাজ্যে নিযুক্ত করেন। বিপুল সংখ্যক সাধারণ ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালীও তখন সর্বত্র অনুপ্রবেশ করে। এই বহিরাগতরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সুযোগ পায়। শুরু হয় মিশ্র প্রজন্মের। এই নব প্রজন্মের লোকজনের ভাষা ও আচার আচরণে মাতৃপিতৃ উভয়দিকের চরিত্র সংক্রমিত হয়। পিতৃ-মাতৃ প্রভাবের অভাবে অনেক বিচ্ছিন্ন পরিবেশে কেউ কেউ ধর্মীয় ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তখন আরাকানের সমাজ ও রাজনীতিতে মুসলিম প্রভাব অপ্রতিরোধ্য ছিলো। রাজা নর মিখলা বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি ম্রোহং অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনিও তাঁর বংশধরেরা বিকল্প মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত হোন। মুদ্রায় ও ইসলামী কলিমা খোদাই করা হয়। ঐ মুসলিম প্রভাবিত ম্রাকু রাজ বংশের ৩৫২ বছরের দীর্ঘ রাজত্বকালকে অনেকে মুসলিম শাসন আমল বলেও অনুমান করে থাকেন। তখনই আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চার পত্তন ঘটে। আলাওলসহ অনেক বাংলা সাহিত্যসেবী আরাকানী রাজশক্তির সহায়তা লাভ করেন। তখনকার আরাকানী মিশ্র জনশক্তি সম্বন্ধে কবি আলাওলের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপছায়াতলে
আরবী মিসরী শামী তুর্কী হাবশী রুমী
খোরাসানী উপবেকী সকল

লাহোরী মুলতানী সিন্ধী কাশ্মীরী দক্ষিণী হিন্দী
কামরুপী আর বঙ্গদেশী
অহ পাই খোটান চারী কর্ণালী মলয়াবারী
আচি কুচি কর্ণাটকবাসী
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু লামা জাতি
আভাই বর্মা শ্যাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কাহিমু ভাতি ভাতি।

সূত্র : পদ্মাবতি

সম্ভবতঃ বিদেশীদের মাঝে সাধারণ বাঙ্গালীদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিলো। তাই শেখ প্রজন্মদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রভাব পড়েছে বেশী। সেই সাথে আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী শব্দাবলীও স্থান করে নিয়েছে। পিতৃ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক শেখ প্রজন্ম, ধর্মীয় আচার আচরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায়, নিজেরাই সেক নামীয় সমাজে পর্যবসিত হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ মুসলিম ও বৌদ্ধ উভয় সমাজের সাথে তাদের রক্তগত উত্তরাধিকার গড়ে ওঠে। ওরা কালক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। নিষ্ঠাবান মুসলিমেরা জেরবাদী, ও মাতৃবংশের সাথে অধিক সম্পৃক্তরা বৌদ্ধে পরিণত হয়। তৃতীয় দলটি ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারায় যথেচ্ছাচারীর রূপ গ্রহণ করে। এখনো এ কারণে এই তিনের মাঝে অধর্মীয় সামাজিক একাত্মতা বিদ্যমান। ভাষা, আচার-আচরণে ওরা প্রতিরূপী মগ।

আরাকানে সেক সমাজের প্রভাব ১৭৮৪/৮৫ খ্রীঃ সালের বর্মী আক্রমণ ও দখলের দ্বারা প্রথম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ম্রাকু রাজবংশের পতন ও স্থানীয় শাসনের অনুপস্থিতি, সেক, চাকমা ও উদারপন্থী মগদের, স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। তারা নিজেদের প্রতি রক্তগত কারণে সহানুভূতিশীল বাঙ্গালীদের আবাস ক্ষেত্র দক্ষিণ চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে ও স্বদেশভূমি উদ্ধারে ব্রতী হয়। তাদের ঐ স্বদেশভূমি উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টারই পরিণতি হলো : বার্মা ও বৃটিশ ভারতের পারস্পরিক উত্তেজনা ও ১৮২৪ খ্রীঃ সালের যুদ্ধ। তাতে বিজিত আরাকান ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়, যাকে মাত্র ১৯৩৬ খ্রীঃ সালে বার্মার নিকট ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

চাকমাদের শেখ প্রজন্মে মিশ্রিত হওয়ার প্রমাণ হলো : তাদের মুসলিম নামকরণ রীতি, আরবী বর্ণ ব্যবহার, ইসলামী ধর্মীয় পরিভাষা ও মুসলিম সামাজিক কথাধারার অভ্যাস এবং মোগলাই আড়ম্বর প্রীতি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালের এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত চাকমা অভিজাতেরা পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত হতেন। মোগলাই লেবাস ও সম্বোধনে তারা ছিলেন অভ্যস্ত।

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮